KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Serial No.: KLMLGK 200…	Place of Publication: ২৫/2 মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection: KLMLGK	Publisher: সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত
Title: অলকার বার্তা	Size: 4.5" x 7" 11.43 x 17.78 c.m.
Vol. & Number: ১৭/১ ১৭/৪ ১৭/৫	Year of Publication: কার্তিক, ১৩৫৩ মাঘ, ১৩৫৩ ফাল্গুন, ১৩৫৩
	Condition: Brittle / Good ✓
Editor: মণিভূষণ দত্ত	Remarks:

CD Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
[illegible] টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কংগ্রে... হিত্য-সংঘের

সর্বজ... ত গীতিনাট্য

অ... দয়

এতদিনে ... কাশিত হইল

মূল্য ... মাত্র

ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্রে...

মনঃসমীক্ষণ

বাংলা ভাষায় এ জাতীয় পুস্তক ... কমই আছে। দাম ৩৲

ডক্টর সুশীলকুমার দের

বাংলা প্রবাদ

...বাংলা প্রবাদের বৃহত্তম সংগ্রহ। দাম ৯৲

•

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের

শহরতলী

আধুনিক সমস্যামূলক অভিনয়োপযো... নাটক। দাম ১৷৷০

শ্রীউমেশ মল্লিকের

...র গায়ে জোর আছে

...বীরদের কাহিনী। দাম ২৲

•

আজব দেশ

দাড়ি-টিকি এই নাটকের পাত্রপাত্রী। দাম ৷০

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ীর

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব

জাতীয়তামূলক কবিতা। দাম ১৲

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো : কলিকাতা

লীলা মৃগয়া

আবেগতপ্ত ভাষায় শচীন্দ্র মজুমদারের প্রথম উপন্যাস

সমুদয় রূপের তিল-তিল আহরণ করে তৈরি হয়েছিল তিলোত্তমা, আর কন্দর্পের কণা-কণা কান্তি আহরণ করে তৈরি হয়েছিল মীনকেতু। বাস্তব সংসারে আর কি তাদের দেখা মিলবে না? বিক্রমমণ্ডলের দিন কি চলে গিয়েছে? আর কি দেখতে পাব না সেই লীলাঙ্কিতবিক্রম, সে ভ্রূভঙ্গবিলাস? মৃগনয়নার চোখ থেকে কি চলে গিয়াছে মৃগয়া? মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, আছে জটিল রাজনীতি, কিন্তু সর্বোপরি আছে প্রেম, আছে আনন্দ, আছে সৌন্দর্য-পিপাসা। এক বলোদ্ধত যুবক আর এক বনসেবিকা যৌবনোজ্জ্বলা নারী। আবেগতপ্ত শাণিত ভাষায় একটি সম্মোহিত কাহিনী। দাম তিন টাকা।

লরেন্সের গল্প

ইংরাজী সাহিত্যে ডি. এইচ. লরেন্সের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। ইংলণ্ডের বনেদী চালের সাহিত্যের জগতে তিনি কিছুদিন মৌসুমী ঝড়ের মতো বয়ে গেছেন। লরেন্সের সাহিত্য-প্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয় এই বইয়ের অনূদিত গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। সম্পাদনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু, ক্ষিতীশ রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। দাম ৩॥০

লেডি চ্যাটার্লির প্রেম

ইউরোপীয় সাহিত্য-জগতে এর মতো ইদানীং আর কোনো উপন্যাস এতোখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেনি। নীতিবাদীদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও ডি. এইচ. লরেন্সের এই বই আজো জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ লরেন্সের অসামান্য প্রতিভা। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনিন্দ্য অনুবাদ। দাম ৪৲

আধুনিক সোভিয়েট গল্প

দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁচটি নতুন গল্প সংযোজিত করা হয়েছে—আধুনিকতম লেখকের পাঁচটি যুদ্ধকালীন গল্প। এতে বইয়ের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দু-রকম মর্যাদাই অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। আর তার উপরে অচিন্ত্যকুমারের অনবদ্য অনুবাদ। দাম ৩॥০

প্রকাশক : সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূচী

কার্তিক ১৩৫৩

প্রসঙ্গ কথা	...	১
শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী	...	১৭
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির"	...	১৯
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল	...	৩৮
পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪০
অগ্নি—"বনফুল"	...	৬১
আমরা ভুলিয়া যাব	...	৮০
সংবাদ সাহিত্য	...	৮১

'শনিবারের চিঠি'র অগ্রিম চাঁদার হার

বার্ষিক ৪৸০ ও ষাণ্মাসিক ২।৶০ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৪৸৶০ ও ২৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৲ ও ৩৷০। প্রতি সংখ্যা ডাকে ।৶১০ ; ভি. পি.তে ।৶০। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়।

প্রসঙ্গ কথা

কঠিনতম সমস্যা

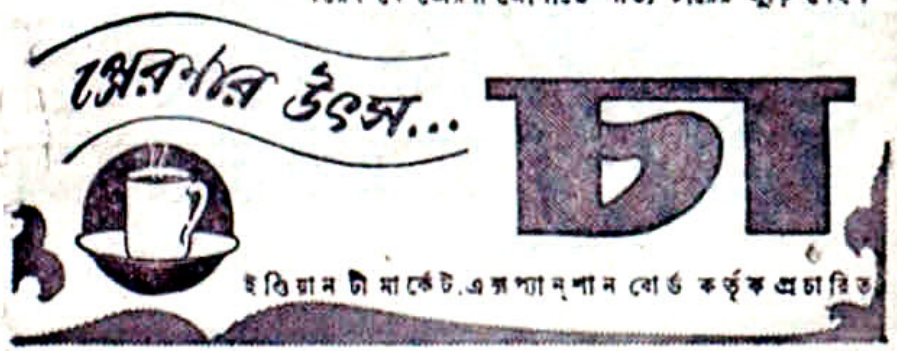

মুসলিম লীগের প্ররোচনায় গত ১৬ আগষ্ট তারিখে লীগ-শাসিত বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতায় যে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ ফল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে আপাতলাভজনক হইলেও যে সুখকর হয় নাই, লীগ-কর্তৃপক্ষের বর্তমান ব্যবহার ও ঘোষণায় তাহাই বোধ হইতেছে। স্বয়ং কোয়াদে-আজম জিন্না সাহেব সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানদিগকে ধীর ও শান্ত থাকিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের নির্ভয় ও নিরাপদ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। হয়তো ইহার ফলে বাংলা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শান্ত ও সংযত হইবেন, শহরে ও মফস্বলে অপর সম্প্রদায়ের উপর নূতন হামলা তাঁহারা করিবেন না। ঈশ্বরের কৃপায় এইরূপ ঘটিলে আমাদিগকে নূতন বিপদ বা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে না। আমরা তৎপরতা ও ধীরতার সহিত ১৬ আগষ্ট হইতে আজ পর্যন্ত উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানে ব্যাপৃত থাকিতে পারিব। নানা ধরনের অত্যাচার ও রাহাজানির ফলে বিবিধ সমস্যা এক কলিকাতাতেই দেখা দিতেছে, সকলগুলি লইয়া আলোচনা সম্ভব নয়। লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ফলে অনেকে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, গত তিন মাস ব্যবসায়-বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধ থাকায় দরুন বহু ব্যক্তি দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন এবং এখনও যানবাহনে ও পদব্রজে চলাচল নিরাপদ না হওয়াতে অনেকের রুজি বন্ধ হইতে বসিয়াছে। অবাধ হত্যার ফলে বহু পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা নিহত হওয়ায় অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এই সকল সমস্যার সমাধান ধীরে ধীরে হইবে। অত্যাচারে অথবা অত্যাচারের আশঙ্কায় স্থায়ী বাসস্থান হইতে পলাতক পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পরিবারকে একত্র করিয়া স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ করিতে হইবে অচিরাৎ, কারণ, যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে আত্মীয়-বান্ধবের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছেন, অথবা দুর্ভাগ্যবশত যাঁহাদিগকে সরকারী বা বেসরকারী সাহায্যকেন্দ্রে আশ্রয় লইতে হইয়াছে, আর বেশিদিন তাঁহারা এইভাবে থাকিতে পারিবেন না; আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হইতেছে এবং আত্মীয়-বন্ধুরাও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছেন। এই সমস্যাগুলি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই সমান তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে। তাই আশা করা যায় সরকারী অথবা উভয় সম্প্রদায়ের

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় একটা আপোস-মীমাংসা সম্ভব হইবে। পার্কসার্কাস-ওয়েলেসলি অঞ্চলে হিন্দুরা ফিরিতে পারিবেন কি না, অথবা বাগবাজার-ভবানীপুর অঞ্চলে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব কি না, এই সকল প্রশ্ন লইয়া নগর-প্রধানেরা ইতিমধ্যেই চিন্তা করিতেছেন; চুড়িপাট্টা-নিকারিপাড়া-দাসপাড়া-বাগমারী-তেলেঙ্গাবাগান-লালা-বাগান প্রভৃতি অঞ্চলের বস্তি পুনর্গঠন লইয়া স্বয়ং বাংলা গবর্মেণ্ট মাথা ঘামাইতেছেন।

কিন্তু এই "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে"র ফলে কঠিনতম যে দুইটি সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজকে কেন্দ্র করিয়াই—ধর্মান্তরিতকরণ এবং নারীহরণ, ধর্ষণ ও পৈশাচিক বিবাহের সমস্যা। শেষোক্ত সমস্যাটির সূত্রপাত কলিকাতাতেই গত আগষ্ট মাসে হইয়াছিল, কিন্তু দুইটি সমস্যাই ভয়াবহ ও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে কুমিল্লা-নোয়াখালিতে। ঢাকা হইতেও এই জাতীয় দুর্ঘটনার সংবাদ আসিতেছে। এই দুইটি সমস্যা শুধু কঠিনতম নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের ইহা জীবন-মরণ-সমস্যা। অচিরাৎ এই দুইটি সমস্যার সমাধান না হইলে নিখিল-ভারতীয় হিন্দুদিগকে জীবনমূল্যে ইহার প্রতিকার করিতে হইবে, নতুবা নোয়াখালি-কুমিল্লার তাণ্ডব সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবে।

মহাত্মা গান্ধী এই রূঢ় সত্য হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই শারীরিক বাধা উপেক্ষা ও তাঁহার সর্ববিধ প্রিয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কুমিল্লা-নোয়াখালিতে উপস্থিত হইয়াছেন। এখানেই তাঁহার সত্য-আগ্রহের চরম পরীক্ষা হইবে এবং এইখানে পরাজিত হইলে তিনি হিন্দুস্থান-পাকিস্তান বিভাগে স্বয়ং উদ্যোগী হইবেন। ভারতীয় কংগ্রেসেরও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এখানেই নির্ধারিত হইবে।

উপদ্রুত অঞ্চলে ধর্মান্তরিতকরণ পরিপূর্ণভাবে (wholesale) অনুষ্ঠিত হইয়াছে—যাহারা মরিয়াছে, পলায়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছে অথবা সমবেত শক্তি লইয়া প্রতিরোধ করিবার সাহস দেখাইয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর সকলকেই এই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। সর্বত্রই একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া ধর্মান্ধ দুর্বৃত্তেরা অনায়াসে যেন খেলাচ্ছলে এই পৈশাচিকতা করিয়াছে। প্রথমে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও হত্যালুণ্ঠনোন্মত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রশ্ন—দিন্ মানো কি না? তাহার পর ভণ্ড মোল্লার কল্মা পড়ানো, ধুতি ছাড়াইয়া লুঙ্গ পরানো ও মাথায় পাকিস্তানী টুপি তুলিয়া দেওয়া এবং সর্বশেষে নিজেদের সহিত এক পংক্তিতে বসাইয়া গোমাংস খাওয়ানো—সর্বত্র এই সহজ কর্মপন্থা অনুসৃত হইয়াছে। পরে হফায় হফায় মোল্লা আসিয়া পাঁচ ওক্ত নমাজ প্রত্যহ পড়াইয়া যাইতেছে। এইভাবে স্বধর্মীয় সংখ্যা বাড়াইয়া যাহাদের লালসা তৃপ্ত হইয়াছে, সত্যকার মুসলমানসমাজ তাহাদের কীর্তিতে নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করিবেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন, ধর্ম, বিশেষত পবিত্র ইসলাম, কখনই এত তুচ্ছ ব্যাপার নহে যে বস্ত্রপরিবর্তনের দ্বারাই তাহার আশ্রয়লাভ করা যায়, প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তির কলমাপাঠ কখনই ধর্মসঙ্গত নয়। এই সকল অনিচ্ছুক ভীরু ব্যক্তিকে স্বধর্মে ধরিয়া রাখিবার জন্য ইসলামজগৎ কখনই উৎকণ্ঠিত হইবেন না। ধর্মান্তরিত লোকদের স্বধর্মে ফিরাইয়া আনা এই কারণেই হয়তো শেষ পর্যন্ত সহজ হইবে।

কিন্তু যে সকল নরপশু ধর্মোন্মাদনায় এই কার্য করিয়াছে বা করাইয়াছে, তাহাদের আয়ত্তের মধ্যে যতদিন ধর্মান্তরিতেরা থাকিতে বাধ্য হইবে, ততদিন বাধ্য হইয়াই প্রাণভয়ে ইহাদিগকে পরধর্মের প্রকাশ্য প্রক্রিয়াগুলি মানিয়া চলিতে হইবে, অন্তরের ধর্ম ইহারা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে সেই সাহস দিবার দায়িত্ব লইয়াই মহাত্মা গান্ধী ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়াছেন, সর্ববিধ অসুবিধার মধ্যে নৌকায় ও পদব্রজে অতিশয় দুর্গমীকৃত এবং স্বভাবত দুর্গম স্থানসমূহে স্বয়ং গিয়া তিনি একদিকে ভয়ে মৃতপ্রায় জড়ভরত মানুষদের দেহে জীবন-সঞ্চারের চেষ্টা করিতেছেন, অন্যদিকে তথাকথিত ধর্মোন্মাদনায় সাময়িকভাবে উন্মত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সুস্থ ও আত্মস্থ করিয়া অসহায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের রক্ষণাবেক্ষণের সকলপ্রকার দায়িত্ব লইবার উপদেশ দিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই নিরলস চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা তিনি এখন পর্যন্ত স্বয়ংই জানেন না। অদ্যকার (১৫ ১১ ৪৬) সংবাদপত্রে দেখিলাম, তিনি নিজেই যেন একটু সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছেন, গৃহচ্যুত ব্যক্তিদিগকে নির্ভয়ে ঘরে ফিরিতে বলার ফলে তাহাদের কেহ কেহ বিপন্ন হইয়াছে, এইরূপ অবগত হইয়া তিনি তাহাদিগকে অন্য পন্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে আরও পক্ষকাল আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করিতে বলিয়াছেন। কিছু কাজ যে হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পলাতকেরা সকলে পরিত্যক্ত গৃহ অথবা ভগ্ন ভিটায় নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিবে কি না, নকল মুসলমান হিসাবে নয়, পৈতৃক ধর্মের মর্যাদা লইয়াই নিরুদ্বেগে চলাফেরা করিতে পারিবে কি না—তাহা নির্ধারণ করিতেই গান্ধীজীকে দীর্ঘকাল উপদ্রুত অঞ্চলে অবস্থান করিতে হইবে। তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছেন এবং এখন পর্যন্ত বলিতেছেন, একটা সমাধান না করিয়া তিনি ফিরিবেন না।

এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হৃদয়বৃত্তির যদি পরিবর্তন না হয় তাহা হইলে মিলিটারি বা পুলিসবাহিনীর সাহায্যে তাহাদিগকে শাসনে রাখিয়া দু-দশদিন মাত্র অন্য সম্প্রদায়ের সেখানে বসবাস সম্ভব হইতে পারে; পুলিস-মিলিটারির শাসনের অবসান ঘটিলেই পুনরায় বিপদ আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থানীয় সংখ্যালঘুরা একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকিলেও যুদ্ধোন্মুখ বৃহৎ পক্ষকে বরাবরের জন্য ঠেকাইয়া রাখিতে

পারিবে না। সুতরাং গান্ধীজীর পথই যে একমাত্র সমাধানের পথ তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যথায় ভবিষ্যতে সংখ্যালঘিষ্ঠেরা ভীরু কাপুরুষের মত না মরিয়া অথবা না ধর্মচ্যুত হইয়া বীরের মত মরিবার গৌরব অর্জন করিতে পারে, সমবেত চেষ্টায় এইটুকু-মাত্র উন্নতি সম্ভব।

স্ত্রীজাতির উপর সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ অথবা ব্যাপক পৈশাচিক বিবাহসমস্যা সর্বাপেক্ষা গুরুতর—ইহাই প্রকৃতপক্ষে কঠিনতম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে এই ধরনের পৈশাচিকতা খুচরা-খুচরাভাবে প্রায়শই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তি বা পরিবারগত দুঃখবেদনার মধ্যেই এগুলির ফলাফল পরিণতি লাভ করিয়াছে। এমনভাবে ইহা কখনই দেশব্যাপী সামাজিক সমস্যা হইয়া উঠে নাই। এই নারী-ঘটিত সমস্যার গুরুত্ব যে কতখানি এবং ইহার প্রতিক্রিয়া যে কত ব্যাপক ও দূরপ্রসারী হইতে পারে, অনুভূতিহীন বর্বরেরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, সূক্ষ্মচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই ইহার অনিষ্টকর পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিবেন। পূর্বে, ঐতিহাসিক কালের মধ্যেই, ভারতীয় পুরুষেরা যখন কাপুরুষ হইয়া যায় নাই, তখন তাহারা জীবনের বিনিময়েও পিশাচের বর্বরতা-প্রতিরোধে অক্ষম হইলে নারীরাই স্ব স্ব মর্যাদা রক্ষা করিতেন; হাসিমুখে দল বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্ম-বিসর্জন করারও ইতিহাস আছে। অধুনা আমরা পুরুষেরা পতিত হইয়াছি। ধর্ম-হীনতার ফলে লোভ ও লালসা প্রবল হইয়াছে, প্রাণে বাঁচিয়া নারীর অসম্মান দেখিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি। কাপুরুষের সহবাসে আমাদের নারীরাও আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইলেও মরিতে ভয় পাইতেছে। মহাত্মা গান্ধী যে স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা বলিয়াছেন, তাহা সকল মহৎ ও মহীয়সী পুরুষ ও নারীর একমাত্র গৌরবময় অবলম্বন ইহা জানিয়াও আমরা বাংলা দেশে তাঁহার নিগূঢ়বেদনাসঞ্জাত উক্তির বিরুদ্ধসমালোচনা মাত্র করিয়াছি। নৈয়ায়িক বাঙালীর বুদ্ধি শ্মশানেও অব্যাহত আছে!

আমাদের কর্তব্যহীনতার কথা আমরা কবে লজ্জার সহিত স্বীকার করিব? কুমিল্লা-নোয়াখালির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েরা অপহৃতা ধর্ষিতা ও পৈশাচিক বিবাহে বাধ্য হইবার পূর্বে দাঁতে শিরা ছিঁড়িয়া অথবা নিজেদের গলা টিপিয়া মরিয়া গেল না কেন, এই সহজ প্রশ্ন করিবার অধিকার উক্ত সম্প্রদায়ের পুরুষদের আছে কি? নারীদের গায়ে হাত পড়িবার পূর্বে তাহারা নিঃশেষে মরিতে পারিল কই? দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে ভয় তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেশের কাজে স্বাধীনতার যুদ্ধে যাহাদিগকে নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করিতে দেখিয়াছি, ব্যক্তিগত চরমতম অসম্মানকে তুচ্ছ করিয়া তাহারাই পলাইয়া অথবা ধর্মের ভোল বদলাইয়া বাঁচিয়া থাকিল কেমন করিয়া?

কিন্তু ইহা ক্ষোভের কথা, হয়তো অবুঝ সেন্টিমেণ্টের কথা। অনেক কষ্টে অর্জিত পরিপুষ্ট এই দেহ-খাঁচাকে সামান্য সম্মানহানির জন্য ত্যাগ করা যায় কি? আমাদের আধুনিক শিক্ষার মধ্যে এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতাকে প্রশ্রয় দিবার ব্যবস্থা নাই। থাকিলে কলিকাতায়, শুধু কলিকাতায় কেন সমগ্র বাংলা দেশের, আ-শরৎচন্দ্র-শ্যামাপ্রসাদ-কিরণশঙ্কর—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে কুমিল্লা-নোয়াখালির সর্বনাশা সংবাদ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া উড়িয়া হউক, ট্রেনে-ষ্টীমারে হউক, পায়ে হাঁটিয়া হউক, সেখানে উপস্থিত হইতেন এবং লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা মাতৃজাতির সম্মান-রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন; দেড় ঘণ্টার বিমান-বিহারে কর্তব্য সমাধা হইয়াছে কেহ মনে করিতে পারিতেন না।

সুখের বিষয়, বাংলা দেশেরই মেয়ে সুচেতা কৃপালানী, লীলা রায়, রেণুকা রায়, কুলরেণু দত্ত, অশোকা গুপ্ত, বীণা দাস এবং খ্যাত ও অখ্যাতনামা আরও অনেকে বাঙালী পুরুষের চরমতম লজ্জাক্ষালনের জন্য তৎপর হইয়াছেন। ওই অঞ্চলের জীবন্মৃত বাঙালী মেয়েদের আশা ও আশ্বাস দিয়া যদি তাঁহারা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন, অপহৃতাদের সন্ধান করিয়া সমাজে পুনর্স্থাপন করিতে পারেন, তবেই কঠিনতম সমস্যার সমাধান সহজ হইবে; কুমিল্লা-নোয়াখালির কলঙ্কিত কাহিনী জাতীয় ইতিহাসের এক অধ্যায় হইয়াই থাকিবে, ভবিষ্যতে দিনের পর দিন রক্তের অক্ষরে তাহার জের টানিয়া চলিতে হইবে না।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সতীন সেন প্রভৃতির নেতৃত্বে অথবা ব্যক্তিগত প্রেরণায় যে সকল পুরুষ জীবন তুচ্ছ করিয়া সন্ধান ও পুনঃসংস্থানের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, এই গুরু সমস্যার সমাধানে তাঁহাদের অংশও বড় কম নয়। ইঁহাদের কেহ কেহ ইতিমধ্যে সগৌরবে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, এই সর্বনাশের কবল হইতে বাংলা দেশ যেদিন মুক্ত হইবে সেদিন আমরা জাতিগতভাবে তাঁহাদের পূজা করিব।

অপহৃতাদের এবং ভুয়া-বিবাহে-বিবাহিতাদের সন্ধান ও উদ্ধারকার্য দীর্ঘবিলম্বিত হইলে চরম সর্বনাশ ঘটিবে, এই কথা স্মরণে রাখিয়া সকলকেই তৎপর হইতে হইবে। আমাদের সামাজিক অব্যবস্থার দরুন মেয়েদিগকে আমরা এমনভাবে গড়িয়া থাকি যে, দুর্বৃত্ত নরপশুদের স্পর্শ তাহাদের মনকে পাথরে পরিণত করিয়া দেয়, তাহারা জড়ীভূত হইয়া অসাড়ভাবে চলাফেরা মাত্র করিতে থাকে; আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া এই অচৈতন্য অবস্থায় বিকৃত অদৃষ্টকে মানিয়া লইতে তাহাদের বিলম্ব হয় না। এইরূপ সামাজিক মৃত্যু ঘটিবার পূর্বেই তাহাদিগকে উদ্ধার করা চাই। এই অদৃষ্ট-মানা অসাড়তার সুযোগ

লইয়া দুর্বৃত্তেরা খুচরাভাবে বাংলা দেশে অনেক নারীর সর্বনাশসাধন করিয়াছে, এবারের এই ব্যাপক সর্বনাশ যে কোনও মূল্যে আমাদিগকে রোধ করিতে হইবে। অত্যাচারীর জীবন ও সংসারের সহিত আপন দুঃদৃষ্টকে জড়াইয়া জড়ীভূত হইয়া পড়িবার পূর্বেই অপহৃতা অশিক্ষিতা ও অপরিপুষ্টমনা নারীর সামাজিক চৈতন্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে; তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সকল অত্যাচার সত্ত্বেও দেহে ও মনে সে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, কোনও কলুষ তাহাকে স্পর্শ করে নাই। গোঁড়ামির গণ্ডীবদ্ধ যে সমাজে তাহার পিতামহী মাতামহীরা একদা লাঞ্ছিত ও বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, সেই সঙ্কীর্ণ সমাজ আজ আর নাই। প্রয়োজন হইলে সমাজপতিদের পাতি তাহাকে দেখাইতে হইবে। সুখের বিষয়, কোথায়ও সে উদারতার অভাব দেখিতেছি না। মহাত্মা গান্ধীর দৈনিক প্রার্থনার সহিত যুক্ত হইয়া সমাজপতিদের এই শাস্ত্রীয় আশ্বাস বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের হিন্দু বাঙালীর কঠিনতম সমস্যা সমাধানে কিছুটা কার্যকরী যে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের প্রধান সহায়

এই দুইটি কঠিনতম সমস্যার দ্রুত ও সম্পূর্ণ সমাধানে আমাদের বাংলা দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। নামে মুসলমান হইলেও কুমিল্লা-নোয়াখালির দুষ্কৃতকারীদের বর্বরতার সমর্থন কোনও ভদ্র মুসলমানই করেন না। দুর্বৃত্তেরা যে এখনও এই অপকীর্তির জের টানিয়া চলিবে, ইহা তাঁহাদের কাহারও কাম্য নহে। মহাত্মা গান্ধী স্থানীয় মুসলমানদের মনের দরবারে প্রত্যহ আরজি পেশ করিতেছেন, কিন্তু ইহাদের বিচারবুদ্ধি অপরিণত; নিজেদের বিবেচনায় ইহারা কদাচিৎ কাজ করিয়া থাকে, কোনও কঠিন সমস্যামূলক বিষয় হইলে নেতা বা মোড়লের পরামর্শ ছাড়া ইহারা এক পা-ও অগ্রসর হইতে চায় না, পারেও না। এই মাতব্বর ব্যক্তিরা ইচ্ছা না করিলে মহাত্মা গান্ধীর কাজ বহুবিলম্বিত হইবে। স্থানীয় মাতব্বরেরা আবার কলিকাতার নেতাদের মুখাপেক্ষী এবং কলিকাতার পলিটিক্যাল নেতারা বোম্বাই-পাঞ্জাবের মুখ চাহিয়া থাকেন। আমরা যাহা চাহিতেছি, ইহাদের নিকট হইতে তাহা পাইতে হইলে দীর্ঘকাল আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। অনমনীয় হিমশীতল জনাব জিন্নার হৃদয় বিগলিত করিবার মত উত্তাপ ভারতবর্ষের কোনও কোণেই এখন পরিলক্ষিত হইতেছে না। তিনি দূরে হিম-মেরুর সন্নিকটবর্তী ষ্টালিন-সূর্যের ধ্যান করিতেছেন, তাঁহার অরুণ-রাঙা রশ্মি পামির উপত্যকা পার হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে এখনও বিলম্ব আছে।

থাকুক, আরও লোক আছেন এবং আমরা তাঁহাদের নিকটই আবেদন জানাইতেছি।

তাঁহারা কেহ বিশ্ব বিখ্যাত নহেন, কিন্তু বাংলা দেশের ভাল করিবার ক্ষমতা এই বিশ্ব-বিখ্যাতদের অপেক্ষা তাঁহাদের বেশি আছে। ভ্রান্ত ও উত্তেজিত বাঙালী জনতাকে শান্ত ও সংযত রাখা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়।

যাঁহারা ইহা করিতে পারেন, তাঁহারা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন এবং স্ব স্ব ক্ষমতা ও সাধ্য অনুযায়ী কাজও করিয়া যাইতেছেন। আজ এই বিপদের দিনে তাঁহাদিগকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নূতন করিয়া মিলনের সেতু রচনা করিতে হইবে। ছেঁদো কথায় বা ভুয়া আস্ফালনের কাজ ইহা নয়। কৌশলী রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের কাজও ইহা নয়। তাঁহারা স্বার্থরক্ষার নামে বিভেদই সৃষ্টি করিতে পারেন; মিলনের মালা গাঁথিতে পারেন যথার্থ ধার্মিক ও সত্যকার সাহিত্যিক সম্প্রদায়। কুমিল্লা ও নোয়াখালির ব্যাপারে বাঙালী হিন্দু সমাজের মনের গ্লানি ও বেদনার পরিমাপ তাঁহারাই করিতে পারিবেন, হক-সুরাবর্দীরা পারিবেন না। ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্ধ না হইলে মৌলানা আক্রাম খাঁ পারিতেন। সমস্ত বাংলা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে আছেন, কেহ বা খ্যাতনামা কেহ বা অখ্যাত, কেহ নামী কেহ নামহীন, ইঁহাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি, হিন্দু মুসলমান সকলকেই স্ব স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবার অধিকার ইঁহারা দান করিবেন ও গ্রহণ করিবেন। মনে পড়িতেছে কাজি নজরুল ইসলামকে, জসিম উদ্দিন, বন্দে আলি মিয়া, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে, ওয়াজেদ আলী সাহেবকে, কাজি আবদুল ওদুদকে, এম. আকবর আলীকে, রেজাউল করিমকে, ডাক্তার কুদরতি খোদাকে, জুলফিকর হায়দারকে, এস, এ, জাফরকে, আমিনুর রহমানকে, নিজেকে শ্রদ্ধা করিয়া অপরকে শ্রদ্ধা করিবার ঔদার্য লেখনী মারফৎ ইঁহারা দেখাইতেছেন, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত গণ্ডী ইঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এম, আকবর আলী তাঁহার 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' পুস্তকের সাহায্যে অতীতের মুসলমান সমাজকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিবার শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছেন, তাঁহার পুস্তকের সদ্য-প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড এই পারস্পরিক হত্যা-হানাহানির মধ্যেই নবজীবনের সন্ধান দিল। কাজি আবদুল ওদুদ সাহেবের দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'কবিগুরু প্রোটে' আমাদের তমসাক্লিষ্ট আতঙ্কগ্রস্ত মনে আলোর আশ্বাস আনিয়া দিল। মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও ভালবাসা ফিরাইয়া আনিবার জন্য ইঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে যে সাধনা শুরু করিয়াছেন, তাহাই যদি আজ বাংলা দেশের শোণিতসিক্ত মৃত্তিকায় সর্বত্র ফলপ্রসূ হইতে থাকে তাহা হইলে আর ভয় নাই। ইঁহাদিগকে আজ আমাদের কাতর আহ্বান জানাইতেছি, নিষ্ক্রিয় দর্শক না থাকিয়া প্রত্যেকেই স্ব স্ব সাধ্যমত জনশিক্ষার কাজে আত্মসমর্পণ করুন, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হইলেই আত্মঘাতের আশঙ্কাও দূর হইবে।

এইমাত্র বন্ধুবর জুলফিকর হায়দরের একটি পত্র পাইলাম। আজমীর হইতে (১১. ১১. ৪৬) তিনি লিখিতেছেন :—

"বাংলায় ফিরে যেতে আর ইচ্ছে ছিল না। বাংলার ইতিহাসে যে কলঙ্কময় রক্তাক্ত অধ্যায় লিখিত হ'ল···দায়ী কে? যখন কলকাতার রাজপথে (১৬।১৭ আগষ্ট) রক্তের ঢেউ ব'য়ে চলেছিল, তখন আমি অমৃতসর জালিয়ানওয়ালাবাগে দাঁড়িয়ে হিন্দু মুসলীম ও শিখ—বর্বর ইংরেজ সৈন্যের গোলাবারুদ কামানের সামনে—বিশাল ভারতের মুক্তযজ্ঞে একসঙ্গে রক্তদানের দৃশ্য কল্পনা করছিলাম।···এমন কেন হ'ল, বিভেদ-জ্ঞান কেন বাড়ছে, দায়ী কে? অসুস্থ শরীর, হাত কাঁপছে, আর বাংলার বাঙালীর দশা শুনে নপুংসক গবর্মেণ্টের অক্ষমতার কথা ভেবে অশান্ত হৃদয়ে আমার ঝড় বইছে, দুঃখ ক্ষোভ রাখবার ঠাঁই পাচ্ছি নে। তবু আমাকে বাংলার বুকে ফিরতে হচ্ছে·· হিন্দু ও মুসলমানের বুকের তপ্ত রক্তরঞ্জিত বাংলার বুকে ফিরতে হবে। গুপ্তঘাতকের শাণিত ছুরিকার ভয়ে পথ চলতে হবে ভয়ে ভয়ে। আতঙ্কিত প্রাণ—বাংলার আতঙ্কিত প্রাণ কবে নিঃশঙ্ক হবে? জানি, জবাব কেউ দিতে পারবে না। শক্তিমান বিরাট পুরুষের আবির্ভাব যেদিন হবে, সেদিন জবাব মিলবে। সেদিনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছি।"

বাংলা দেশে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব এই নিদারুণ আত্মঘাতের মধ্যে কল্পনা করিতে পারিতেছি না, তবে আশা করিতে পারিতেছি যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে দেশকে শান্ত ও নিরুপদ্রব করিয়া মহাপুরুষের আবির্ভাব-সম্ভাবনাকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন। কুমিল্লা-নোয়াখালিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে তাহা তাহারা ভুলিয়া যাইবে, যদি তাহাদের অপহৃতা ও বলপূর্বক অধিকৃতা নারীদের বিনা-বাধায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়, হিন্দুরা সকলে যদি হিন্দু-হিসাবে তাহাদের মধ্যে নিরুপদ্রবে বসবাস করিবার অধিকার লাভ করে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও মানবতার নামে বাংলা দেশের মুসলিম শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সর্বাধিক কল্যাণ হইবে। তাঁহারাই আমাদের প্রধান সহায়।

যদি হয়—

মহাত্মা গান্ধীর অভিযান যদি সফল হয়, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠদের আশ্বাসে ও সহায়তায় যদি স্বগৃহে ও স্বধর্মে পুনরাগমন করে, এবং ধর্ষিতা অপহৃতা ও পৈশাচিক-বিবাহে-বিবাহিতা নারীগণ যদি স্ব স্ব সংসারে ও সমাজে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের কোনও কুখ্যাত ও অখ্যাত কোণে অদ্ভ গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা এখনও বজায় থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সসম্মানে তাহাদের

প্রত্যুদ্গমনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক এক মন্বন্তরে সমাজ-ব্যবস্থা স্বভাবতই পরিবর্তিত ও সংস্কৃত হয়। বর্তমান মন্বন্তরে যে সঙ্কটের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি তাহা অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব না হইলেও কঠিন। এই সঙ্কটকালে সমাজপতিরা ও সমাজসাধারণ যদি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হন, তাহা হইলে জাতির সর্বনাশ ঘটে। ইহার বহু প্রমাণ আছে ও অনেক মূল্য দিয়া আমরা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। সুখের বিষয় সাময়িক সংবাদপত্র মারফৎ দেখিতেছি, সমাজপতি পণ্ডিতেরা সুস্থ মন লইয়া অবহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সমবেত উদারতা এই সঙ্কটকালে আমাদিগকে রক্ষা করিবে। যাঁহারা উপদ্রুত অঞ্চল হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই উপর জোর করিয়া "মুসলমান" ছাপ দেওয়া হইলেও ইতিমধ্যেই তাঁহারা সহজভাবে স্বসমাজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন; অনেক ক্ষেত্রে শাখা-ভাঙা নোয়া-খালি সিঁদুর-মোছা মেয়েরাও পতি ও পরিবারের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হন নাই। শিক্ষিত সমাজে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর বুকে কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর চাপিয়া আছে এবং যাঁহারা এই সর্বনাশা উপদ্রবে সর্বস্বান্ত ও অসম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ছুঁৎমার্গের প্রভাব কাটাইয়া ঘোরতর আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন। শাস্ত্রের নজির ও পণ্ডিতদের পাতি এই-জাতীয় দুর্গতদের জন্তই প্রয়োজন, অন্তত্র ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। জোর করিয়া কলমা ও নমাজ পড়াইলে অথবা গোমাংস খাওয়াইলে যে জাতি যায় না, তাহা আজকালকার শিশুরাও বোঝে। কাহাকেও বুঝানো কঠিন নয়। নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলের গ্রামের ইস্কুলের এক পণ্ডিত দুর্বৃত্তদের হাতে আটক থাকার কালে বাধ্য হইয়া নমাজ পড়া ও ওয়াজ করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান নিজেই স্থির করিয়াছিলেন, তিনি অবিরত গায়ত্রী জপ করিতেন, ইহার দ্বারাই তিনি ভাঙিয়া পড়েন নাই, আত্মিক বল বজায় রাখিয়াছিলেন। দৈনিকপত্রে পরে পণ্ডিতেরাও এই বিধান দিয়াছিলেন।

অপহৃতা ও ধর্ষিতা মেয়েদের মনের গ্লানি অত সহজে কাটিবার নহে। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা অন্ধভাবে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসরণ করিয়া মনে মনে গ্লানিমুক্ত হইতে পারেন; যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, সুস্থ ও স্বস্থ হইবার জন্ত তাঁহাদের অসাধারণ মনের বল প্রয়োজন। ইঁহাদের প্রত্যেককেই চারিদিক হইতে সাহস ও মনের বল জোগাইতে হইবে, ছুঁৎমার্গের সঙ্কোচের দ্বারা কোনমতেই যেন ইঁহাদিগকে পীড়া না দেওয়া হয়, পরিবারের কর্তাকে সর্বদা এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলিকাতার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের বিধান তাঁহাদের সহায় হইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-বেদান্ততীর্থ, শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য, পণ্ডিত শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীশরচ্চন্দ্র

সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মিলিত-ভাবে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"সম্প্রত্যত্যাচারেণ নিপীড়িতানাং বলাদ্ধর্মান্তরং গ্রাহিতানাং জনানাং ধর্ষিতানাং চ নারীণাং হিন্দুত্বম্ অক্ষুণ্ণমেব। বলাদ্ বিবাহোঽপি অবিবাহ এব শাস্ত্রদৃষ্ট্যা। তেষাং সর্বেষাং স্বসমাজে যথাপূর্বং সাদরম্ অবস্থানং নির্বিবাদম্ ইতি সর্বে ধর্মাচার্যা বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণাশ্চ ঐকমত্যেন ঘোষিতবন্ত ইতি।

"বর্ত্তমান অত্যাচার-নিপীড়িত ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত জনসমূহের ও ধর্ষিতা নারীগণের হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। বলপূর্বক বিবাহ হইয়া থাকিলেও তাহা শাস্ত্রদৃষ্টিতে বিবাহই নহে। তাঁহাদের সকলেই স্বসমাজে পূর্ববৎ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কাহারও কোনও মতভেদ নাই—ইহা সকল ধর্মাচার্য, বিদ্বদ্বর্গ ও ব্রাহ্মণমণ্ডলী একবাক্যে ঘোষিত করিয়াছেন। ইতি"

অবশ্য অপহৃতা, ধর্ষিতা ও পৈশাচিক-বিবাহে বিবাহিতা মেয়েদের সমস্যা বিবাহের কারণে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। তাহার ব্যবস্থাও সমাজপতিরা দিয়াছেন। যাহারা বিবাহের উপযুক্ত, তাহাদের বিবাহের ব্যবস্থা সমাজকেই করিতে হইবে, সমাজের সকলকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রত্যহ দেখিতেছি, সমাজসেবী উদারমনা যুবকেরা এই-জাতীয় মেয়েদের বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহাদের অনেকের আগ্রহ যে খাঁটি, ধীরস্থিরভাবে ভালমন্দ সকল দিক বিচার করিয়া এবং সর্বপ্রকার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়াই যে ইঁহারা অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসপ্রবণ, হুজুগে, মতলববাজ লোকও আগাইয়া আসিতে পারে। বিবাহের পূর্বে তাহাদিগকে বাজাইয়া দেখিতে হইবে, শুধু সৎ উদ্দেশ্যই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, হৃদয়বান ধীরমস্তিষ্ক যুবকেরা স্বেচ্ছায় এই কাজে অগ্রসর হইলে এই সকল বিবাহ কল্যাণপ্রসূ হইবে, এবং সামাজিক উৎপীড়ন হইতে মেয়েরা চিরতরে রক্ষা পাইবেন। বাংলা দেশের যুবকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। আমরা জানি, জাতির এই সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁহারা পিছাইয়া থাকিবেন না।

এই মেয়েদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রয়োজন।—

(ক) যাহারা আক্রান্ত হইবার পূর্বেই পলাইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে।

(খ) যাহাদের বলপূর্বক মুসলমান নাম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বে-ইজ্জৎ করা হয় নাই।

(গ) ধর্ষিতা কুমারী বা বিধবা।

(ঘ) যে সব কুমারী তথাকথিত 'বিবাহে'র বলিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমাজ সধবা নারীদের তথাকথিত 'বিবাহ' গ্রাহ্যই করিবে না, তাঁহাদের পূর্ব সম্মান ও প্রতিষ্ঠা যথাযথ বজায় রাখিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, যাঁহাদের মনে গ্লানি আছে, তাঁহারা আত্মশুদ্ধির জন্য গঙ্গাজল পান অথবা গঙ্গাস্নান, হরিনাম অথবা গায়ত্রী জপ করিতে পারেন। অনাবশ্যক ক্ষেত্রে শুদ্ধিপ্রসঙ্গ উঠিবেই না।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভা এই সকল কাজে তৎপর হইয়াছেন, এবং বিবাহ-খাতে নোয়াখালি রিলিফ কমিটি কয়েক হাজার টাকা মজুত রাখিতেছেন। আশা করা যায়, উপযুক্ত যৌতুক—অর্থাৎ যৌতুকলব্ধ অর্থে ব্যবসায়-আদি পত্তন করিয়া আজীবিকার সুবিধা পাইলে বিবাহেচ্ছু সৎ যুবকের অভাব হইবে না। যাঁহাদের ক্ষমতা আছে তাঁহারা প্রত্যেকেই এই কার্যে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করিবেন।

আর একটি বিষয়ে আমাদিগকে অবিলম্বে সচেতন হইতে হইবে। বাংলা দেশের তথাকথিত হরিজন সমাজকে আচার-বিচারের অন্ধ গোঁড়ামির দ্বারা পৃথক করিয়া দিয়া আমরা সমাজের শক্তিক্ষয় করিয়াছি। অবশ্য আজকাল যে একটা কথা সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে—বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ধর্মান্তরের আশ্রয় লইয়াছেন বা আশ্রয় খুঁজিতেছেন—তাহা ঠিক নয় বলিয়াই আমাদের ধারণা। কারণ আমরা দেখিতে পাই, নমশূদ্র প্রভৃতি জাতি পূর্ববঙ্গের সর্বত্র বর্ণহিন্দুদের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সমাজে বাস করিয়া নিরুপদ্রবে থাকেন। নমশূদ্রদের স্বধর্মে আনিবার জন্য ভিন্নধর্মীরা প্রথমেই বর্ণহিন্দুদের কাছ হইতে তাহাদিগকে ছলে-বলে-কৌশলে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। যতক্ষণ বর্ণহিন্দু ও নমশূদ্র একত্র থাকে ততক্ষণ তাহারা অজেয়। কুমিল্লা-নোয়াখালির তাণ্ডবে এই বিচ্ছিন্ন করার কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, আমাদের দুর্ব্যবহারেই হউক, অথবা স্বার্থপর লোকের কূট প্রচারের ফলেই হউক, হরিজন-সমাজের সহিত আমাদের চিরদিনের সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যে কোনও মূল্যে এই সদ্ভাব পুনঃস্থাপন করিতে হইবে। দীর্ঘকাল উপযুক্ত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের অতিশয় অসহায় ও অশ্রদ্ধেয় অবস্থার মধ্যে আমরাই নিক্ষেপ করিয়াছি, আমাদিগকেই আবার আহারে-বিহারে জ্ঞানে-কর্মে তাহাদের সহিত সামঞ্জস্য-বিধান করিতে হইবে। লীগ ও ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্ররোচনায় স্বার্থসন্ধী আধেদকর হিন্দুসমাজে যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দেশের ও জাতির সর্বনাশ করিতে চাহিতেছেন, তাহা অবিলম্বে রোধ করিতে হইবে, শক্তির উৎসকে অবরুদ্ধ করিলে শক্তিপরীক্ষায় আমরা টিকিব না। আমরা যে হঠাৎ নূতন কিছু করিতে চাহিতেছি, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। একশো পনেরো বছর পূর্বে আমাদেরই এই বাংলা দেশের "নববাবু"রা যে

এই সমন্বয়-চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাইতেছি। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে এইরূপ একটি সংবাদ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে—

"বাঁশবাড়িয়া নিবাসিনঃ ৺ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৺ রামলোচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণকিঙ্কর গুণাকর এবং শ্রীযুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত মতিলাল বাবু এই কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনির্ম্মিতা বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুসুম মাল্য প্রদান-পূর্ব্বক পরম সুখে পরম সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছে।"—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৯

অর্থহীন জাত্যাভিমানে আমাদের সুদিনে অনেক গিয়াছে, আজ এই দুর্দিনেও কি আমাদের জ্ঞানোদয় হইবে না?

আর একটি অতিশয় আশ্বাস ও কৌতুকপ্রদ নজির বাংলা দেশের জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ধর্মান্তরিতকরণরূপ অত্যাচারের প্রতিকারে বর্তমানকালের পণ্ডিত ও সমাজপতিরাই যে শুধু ব্যবস্থা দিতেছেন এরূপ নহে, আজ হইতে ঠিক এক শত বৎসর পূর্বে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজ অনুরূপ ব্যবস্থাপত্র প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। সমগ্র বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ স্থান হইতে এক শত পণ্ডিত এই ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে সেকালের যাবতীয় খ্যাতনামা পণ্ডিতের নাম পাইতেছি। এই ব্যবস্থাপত্রিকা একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, পুস্তিকাটির নাম 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক'। ভূমিকাটি উদ্ধৃত করিলে এই ব্যবস্থাপত্রের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে।—

"বেদধর্ম্মাক্রান্ত সর্ব্বসাধারণ জন প্রতি পতিতোদ্ধার সভার সভ্যগণস্য নিবেদন।

"যেহেতু আমাদিগের হিন্দু জাতির মধ্যে পরধর্ম্ম যাজন বিষয়ে কেবল পতনের পথ পরিসর ও উদ্ধারের পন্থা সাধারণ পক্ষে নিতান্ত রুদ্ধ থাকায় আমাদিগের দলবল যাহা পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও প্রবল ছিল তাহা স্বকীয় রাজ্যহীনাবস্থা প্রযুক্ত এবং দুর্দ্দান্ত মুসলমানহস্তে পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার অন্যায় বল অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতাদি শাস্তি দ্বারা বহুজনের ধন প্রাণ নষ্ট হবাতে অত্যন্ত ক্ষয় পায় যৎকর্ত্তৃক অধিকাংশ হিন্দু নিরুপায় বিধায় মুসলমানীয় ধর্ম্ম অঙ্গীকার করে তৎপ্রযুক্ত হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে ক্রমশঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের ভাগ অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তদনন্তর

মুসলমানীয় অস্ত্রাবশিষ্ট যাহা কিঞ্চিদংশ হিন্দু অবশেষ ছিল তাহা কৃশ্চান মহাশয়েরা এ প্রদেশে অধিকার প্রাপ্তে মন্ত্রণা ছলনা দ্বারা প্রতিদিন ক্ষীণ করিতেছেন।

"কিন্তু নিরুপায় হিন্দুদিগের অন্য ধর্ম্ম যাজনপূর্ব্বক জাতি পতন হইলে এইক্ষণকার ব্যবহার মত তাহা হইতে সাধারণের উদ্ধারপথ রোধ প্রযুক্ত সকল ম্লেচ্ছরাই সাবকাশ মতে তাহাদিগের ধর্ম্ম-যাজনাদি দ্বারা লোকের জাতিপাতন বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দু জাতির প্রতি অধিক চেষ্টা ও আক্রমণ করে তাহার কারণ এই যে, অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত যথা মুসলমান ও কৃশ্চান তন্মধ্যস্থ কোন মুসলমান ব্যক্তি ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করতঃ পরে পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বধর্ম্ম যাজন ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তরূপ "তৌবা" করিলে পুনরায় অনায়াসে মুসলমান হইয়া সকল মুসলমানের সহিত স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক প্রচলিত হইয়া থাকে তাদৃশ কোন ব্যক্তি কৃশ্চান মুসলমানীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইলে মতান্তরবিধায় অক্লেশে পুনর্ব্বার কৃশ্চান হইয়া সমুদায় কৃশ্চানদিগের মধ্যে অপ্রভেদপূর্ব্বক চলিত হয়, এই বিশেষ কারণ প্রযুক্ত ঐ সকল ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা পরস্পরকে আত্ম-ধর্ম্ম যাজনে বিশেষ অর্থাৎ তদ্রূপ যত্ন করে না যদ্রূপ পশ্চাদুক্ত উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় ন্যায় হিন্দু প্রতি চেষ্টা করে, যে হেতু সকল ম্লেচ্ছাদিজন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলেও উহাদিগের উদ্ধারপন্থা সুলভ বিধায় তাহাতে স্থায়ী সম্ভব নহে, কিন্তু হিন্দুজাতীয় নিরাশ্রয় নিধন জন দৈবাৎ ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছধর্ম্ম একবার অবলম্বনপূর্ব্বক তজ্জাতিপ্রাপ্তোত্তরকালে তাহার রাগভ্রান্তি শান্তি হইলে এবং উক্ত স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম প্রতি ঘৃণা জন্মিলেও কেবল আক্ষেপে ময় ও মনোদুঃখিত হইয়া চিরপতিত থাকিয়া আজন্ম-কাল বিবিধ চেষ্টায় উদ্ধার হয় না, কেবল ধনাঢ্য অথবা মহদাশ্রিত কোন ব্যক্তি এ প্রকার বিপদে পতিত বিশেষ চেষ্টা করিলে ক্বচিৎ ত্রাণ পায়।

"অতএব নিবেদন এ বিষয় উত্থাপনের তাৎপর্য্য ম্লেচ্ছদিগের আধুনিক ধর্ম্ম অস্মদাদি সম্বন্ধে উক্ত মতে আক্রমণ ও কৌশল পূর্ব্বক যাজন বিরোধে আমাদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের দল বল রক্ষণাবেক্ষণ উপায় অন্বেষণ ভিন্নও অন্য কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম ও যুক্তিবিরোধী বিষয় ঐ উপলক্ষে লক্ষ্য হইতেছে যে কোন ব্যক্তি অবোধপুরস্কারে আত্মসম্বন্ধীয় এমত কোন প্রকার অপরাধগ্রস্ত হইলে যৎকর্ত্তৃক অন্যের অপকার অসম্ভব, পরে তাহার আত্মভ্রম প্রকাশ পাইলে তদ্দোষক্ষালন কারণ যথোচিত দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার প্রাপ্তে তথাচ যদি সে অপরাধ মার্জ্জনা না হয় তবে তাহা যুক্তিবিরোধী ও অবিচার কি না?"

ভাষা কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলেও একটু অনুধাবনপূর্বক পড়িলে সকলেই ইহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন ও বিস্ময়বোধ করিবেন। পুস্তিকা আরম্ভ হইয়াছে এই বিচার দ্বারা—"যেমন সকল অপরাধের দণ্ড তেমন সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, তবে কেন বিধর্মে পতিত হিন্দু মুক্ত হয় না?" বিচারে দেখানো হইয়াছে যে, মুক্ত হয়। তাহার পরেই বিচার করা হইয়াছে যে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পতিত যদি মুক্ত হয় "তাহার সহবাসে অন্যজন কি প্রকারে পতিত হইতে পারে এবং তৎসহবাসে তৎকালে কি অনিষ্ট সম্ভাবনা যথা শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া?" পরে মনু প্রভৃতি বিধানকারের দীর্ঘস্থায়ী প্রায়শ্চিত্তের

অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যথা, "কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ। যেহন্যে চ পাপা যদ্‌ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভু বিষ্ণবে নমঃ অর্থাৎ কিরাত প্রভৃত যবনাদি পাপজাতি যে ভগবানের ভক্তাশ্রিত হইলে শুদ্ধ হয়, সেই প্রভু ভগবানকে নমস্কার।"

"ম্লেচ্ছধর্ম্মযাজী হিন্দুর কি কি দোষ" ইহার বিচার করিতে গিয়া বলা হইয়াছে—

"অখাদ্য অপেয় অগম্যা ব্যবহারাচরণ করণ কারণ তাহারা উৎকট দোষী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ বটে, কিন্তু শাস্ত্রে ঐ সকল পাপের বিবিধ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সত্বে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষা হইলে তাহাকে তদ্দারা উদ্ধার না করিলে আমাদিগকেও শাস্ত্র অমান্য জন্য অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে এবং ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি যদি এ সকল কর্ম্মে প্রয়োগ না হয় তবে কি কার্য্যে লাগিবে ও কি উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়াছে? অপিচ যদি সে প্রায়শ্চিত্তে সন্দেহ হয় তবে ঐ সকল কর্ম্ম পাপজনক কি প্রমাণে নিশ্চয়?

"অপরঞ্চ মহাশয়রা বিবেচনাপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে সুগোচর হইবে যে উপস্থিত বিষয় প্রতি বর্ত্তমানকালীয় ব্যবহারানুযায়ী আপাত্ত উপযুক্ত নহে যেহেতু ইদানীং এই মহানগর কলিকাতায় অনেক হিন্দুতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষ কিয়দংশে দ্বিবিধ কিঞ্চিদংশে একবিধ অত্যল্পাংশে অস্বকৃত বোধে নির্দ্দোষ কিন্তু সংসর্গ সহকারে তাহাতেও তুল্য দোষ এবং ইহার নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামবাসিগণেতেও আংশিক দোষ স্পর্শ হইয়াছে, এতদ্বিধায় যদ্যপি উক্ত দোষ জন্য (যাহাই ম্লেচ্ছযাজী হিন্দুর পক্ষে চিরপতনের প্রধান কারণ প্রকাশ পাইতেছে) লোকের জাতিপতন স্বরূপ দণ্ড করা উচিত হয় তবে ঐ বিষয়ের সীমা কি পর্য্যন্ত যায় তাহা মহাশয়রা নিরূপণ করিবেন। এতাবতা স্বেচ্ছাচার আহার ব্যবহারীয় চর্চ্চা ইতিমধ্যে উত্তোলনে তদ্ভোগী মহাশয়দিগের প্রতি দোষ নিক্ষেপ কোন মতে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে বরং তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ স্থাপনাপূর্ব্বক ও নিম্নে লিখিতব্য মতে তাঁহাদিগের বল আশ্রয় করণক পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্ধার চেষ্টা করা, নচেৎ ঐ সকল তেজস্বী মহাশয়দিগের সুখভোগাদি কার্য্যেতেই যে যথার্থ কোন দোষ জন্মে কিনা তাহা বিশেষ রূপ না জানিয়া সামান্য চলিত মতে তৎকার্য্যপ্রতি দোষারোপণে অস্মদাদি অপরাধী হইবার সম্ভাবনা, কারণ আমাদিগের বেদ ও তন্ত্রাদি মতাবলম্বিত শাস্ত্র সকল সমুদ্রতুল্য অকূল, যন্মধ্যে বহুবিধ বিষয় একমতে নিষিদ্ধ অন্যমতে বিধেয় যথা বামাচারী শাক্ত মত তথা মহানির্ব্বিকারী পরমহংস পন্থা, বৈষ্ণব ও যতি ধর্ম সহিত পরস্পরের প্রতি যোজনায় একের বিধি ব্যবহার অন্যের বিপরীত লক্ষ্য হয়, পরন্তু ঐ চতুর্ব্বিধ সাধকই আমাদিগের পক্ষে পূজ্য ও মান্য তন্নিমিত্ত উক্ত মত ব্যবহারাদিতে দোষ নির্ণয় করণে অতিশয় সংশয় প্রত্যক্ষ হয়। অতএব যদিও যথেষ্টাচার আচারাদি দোষ জন্য গণ্য হয়, কিন্তু যখন প্রায় সকলই (যন্মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠবর্ণ মহামহোপাধ্যায় কুলীন মহাশয়রাও আছেন) উক্ত প্রকার ব্যবহার না করিয়া কচিৎ স্নেহ কদাচিৎ অনুরোধ কখন দয়া কুত্রাপি লোভ কিম্বা ক্ষোভবশতঃ নিষিদ্ধব্যবহারী ব্যক্তিগণ সহিত (যাহারা একণে হিন্দু মধ্যে দলে বলে অধিক পুষ্ট) মিশ্রিতভূত সম্যক্ প্রকারে প্রচলিত আছেন তখন স্বকৃত ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বী (যাঁহাদিগের দোষ বাস্তবনিষিদ্ধব্যবহারী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক গুরুতর নহে)

শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার ও উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহাদিগকে আমাদিগের সহিত চলন করণে কি হানি সম্ভাবনা আছে?

"অতএব নিরপেক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ জাতি কুলাধ্যক্ষ ধর্ম্মাশ্রয় মহাশয়গণ কৃপাবলোকন পূর্ব্বক বিচার করিতে আজ্ঞা হয়, যে যৎকালীন কশ্চিৎ ধনাঢ্য অথবা মহাদাশ্রিত ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে মুসলমানীয় ধর্ম্মাচরণ করণক পতিত হইয়া পুনরায় ধনবলে উদ্ধার হয়, এবম্প্রকারে কোন ব্যক্তি সমুদয় নিয়মানুসারে মিসনরি চর্চ্চে বেপ্টাইষ্ট হইয়া কোন প্রবল মহাত্মার সহায়তায় পুনর্ব্বার ত্রাণ পায় পরে ঐ প্রকার উদ্ধৃত সকল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক অবিবাদে সম্যক প্রকারে প্রচলিত আছে, এতদ্দৃষ্টান্তে অপর সাধারণ নিরাশ্রয় নির্ধন পতিতগণ পক্ষে তৎপরিমিত করুণাঙ্কুর প্রকাশ না করিয়া তাহা হইতে যাবজ্জীবন তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা ধর্ম্মতঃ ও যুক্তিসম্মত স্পষ্ট পক্ষপাত ও অবিচার কি না? তজ্জন্য নিতান্ত ন্যায্য বোধে ও তৎকর্ত্তৃক বিশেষ দৃঢ় ভরসা পূর্ব্বক প্রার্থনা যে মহাশয়দিগের সদৃশ সদ্বংশ জাত মহোদয় জাতিকুলাশ্রয় মহাত্মাগণ ঐ সকল অন্যায় অদ্যাবধি রহিত করিয়া দেশ কাল ব্যবহার দৃষ্টে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মাভিপ্রায় সম্মত এবং ন্যায় ও যুক্তি সম্মত সাধারণ পক্ষে বিনা গণতা সমতা বিধায় বিচার করিতে অবশ্যই আজ্ঞা করিবেন। যেহেতু পতিতের পরিত্রাণ লোকের জাতিকুলদান বিশেষতঃ সাধারণ পক্ষে সমান অকুতোভয়ে বিনালোভ গণতা রহিত ক্ষমাবান ও শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টি ও আঢ্য পূর্ব্বক সম্মান মহান্ ও অতিপ্রধান সর্ব্বতোভাবে যোগ্য প্রতাপবান (যাঁহারা সদ্বংশ জাত প্রযুক্ত স্বভাবতঃ পরোপদুঃখে দুঃখী ও পরদায়ে কাতর) কর্ত্তৃক মনোযোগ ও দৃঢ় প্রকাশ ব্যতীত অন্যের দুঃসাধ্য, তদ্ভিন্ন নিষ্ঠুর সাঙ্কারী বিদূষক পরোছিদ্রানুসারী জনকর্ত্তৃক বরং এমত মহৎকার্য্য সাধনোদ্যোগে অন্যায় প্রতিকূল তর্ক আপত্তি বহুবিধ ব্যাঘাত সম্ভব। যেমন তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কহেন "যে এমত প্রকরণ একাকার করিবার লক্ষণ" কিন্তু কি চমৎকার হিতে বিপরীত ব্যবহার প্রাগুক্ত রূপ বিনা প্রায়শ্চিত্ত সুখোন্মত্ত সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারে রত স্বেচ্ছাচারীগণ সহিত যাঁহারা অম্লানবদনে অন্নাদি ভোজন প্রভৃতি সকল করণ কারণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই এমত পাতককে যে যাহারা ঈশ্বরানুসন্ধান জন্য ভ্রমক্রমে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বী হয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংগ্রহণে ভূরি ভূরি আপত্তি ও বিতণ্ডাগী তদুদ্দেশী পক্ষ প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ করেন। হায় কালের কি অপূর্ব্ব গতি, লোকের কি বিচিত্র মতি, ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি অদ্ভুত রীতি পদ্ধতি! যথা বৃথা মাংসাশী বৈধমাংস প্রতি দ্বেষী, আত্মমতই প্রবল আত সেই তাঁহাদিগের স্মৃতি অপরম্বা কিম্ভাবিষ্যতি !!!

"ইতিপূর্ব্বে মহাত্মাগণ কত শত অধম ও পতিত ত্রাণ করিয়াছেন, যথা অধমনিস্তারী জনহিতকারী ৺চৈতন্যদেব ভগবন্নামশ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা কএক জন জাত মুসলমানকে

উদ্ধারকরণক হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে উচ্চ ও বহুজনপূজ্য পদ লেন, এবং স্বর্গগত পরোপকারব্রত রামদুলাল সরকার মহাশয় কিঞ্চিৎ মুসলমানধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু ব্যক্তিকে উদ্ধারান্তে বৃহৎ সমারোহ পূর্ব্বক সমন্বয় দ্বারা হিন্দু-জাতি মধ্যে পুনর্ব্বার চলন করেন।"…

যে যে ব্যক্তি অবোধ পুরস্কারে এই মহৎ উদ্যোগ ভঙ্গ করিবেন তাঁহাদিগকেও এই ব্যবস্থা চলনাভাবে কালেতে স্বতঃ পরতঃ উক্ত মত ব্যাভিচারে পতিত দায়গ্রস্ত ভূত এবং তদুদ্ধার উপায়রহিত প্রযুক্ত চিরকাল রোদন করিতে হইবে ও তখন উপস্থিত কর্ম্ম সম্পর্কে বিপক্ষতা স্বরূপ স্বকৃত কার্য্যের প্রতি ধিক্কার পূর্ব্বক আক্ষেপ সার হইবে এমত কেহ ভ্রান্তি না করেন যে এদায় তাঁহার স্বকুলে ঘটিবে না, কারণ যখন এ প্রদেশে দস্যুদল ধনে জনে ছলে কৌশলে অতি প্রবল রাজসাহায্যে দর্পিত সর্ব্বদা সকল স্থানে সচেষ্টা সন্ধানে দিনে দিনে বৃদ্ধিপূর্ব্বক প্রবৃত্ত আছে তখন কে কতক্ষণ সাবধানে সমর্থ হইবেন এবং সে বিপদে পড়িলে কাহার দোহাই দিবেন যেহেতু উক্ত মত বিপদ্‌গ্রস্তদিগের যে রোদন তাহা উপস্থিত বিচারকর্ত্তারা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত প্রযুক্ত মহোল্লাস যুক্ত শ্রবণ করেন।

উপসংহারের আবেদনটিও চমৎকার এবং অধুনা সমভাবে প্রযুজ্য—

"অতঃপর সদ্‌গুণাকর সুবিজ্ঞবর মহাশয়রা উদিত বিষয় প্রতি মনোযোগপূর্ব্বক বিশেষ বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়কে শেষ সাবকাশ জানিয়া হিন্দু জাতি চিহ্ন থাকিতে এমত বিহিত উপায় স্বরায় করিতে আদেশ হয় যদ্দ্বারা পৃথিবী এককালে হিন্দুশূন্যাভূতা বেদ-বিহিত সনাতন ধর্ম্ম নিতান্ত লোপ না হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনামতে আমাদিগের উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থানুযায়ী সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতি সহিত ব্যবহারকরণ সর্ব্বসাধারণ পক্ষে আজ্ঞা করেন ইতি।"

যদি না হয়—

মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সত্য ন্যায় ও যুক্তির মহিমা স্বীকার না করিয়া তাহাদের অন্যায় ও বর্বর দাবি বজায় রাখিয়া চলে, তাহা হইলে নোয়াখালি-কুমিল্লার অসহায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের উদ্ধার ও রক্ষা এবং অপহৃতা ও ঘুটা বিবাহের বন্দী নারীদিগকে সন্ধান করিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব সমগ্র হিন্দু-সমাজকে লইতে হইবে। ভগবান করুন, কঠিনতম সমস্যা সমাধানের এই চরম পন্থা যেন তাহাদের অবলম্বন করিতে না হয়।

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

১৯১৪ সনে শরৎচন্দ্র বেঙ্গুন হইতে পরলোকগত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। উহা নিম্নে মুদ্রিত হইল। শ্রীযুত শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তদীয় পিতাকে লিখিত পত্রখানির প্রতিলিপি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার ধন্যবাদভাজন।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon. 7. 1. '14

প্রিয় মণিবাবু, অনেক দিন হইয়া গেল আপনার চিঠির জবাব দিই নাই। এই ত্রুটির জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া আছি, ইহার উপর আপনি আর যেন কিছু মনে করিবেন না।

আপনার লেখার সমালোচনা শুনিয়া আপনি যে দুঃখিত হন নাই একথা আপনার নিজের মুখে শুনিয়া বড় স্বস্তি পাইলাম। মাঝে মাঝে ভাবিতাম, আমার নিজের ত এই বিদ্যা, অপরের দোষ দেখাই, হয়ত বা তিনি কি ভাবিয়াছেন। যাক্—বড় সুখী হইয়াছি।

আমি তার পরেও আপনার বইটা আর একবার আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম, সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে—এবার আরও যেন একটু বেশী করিয়া বুঝিয়াছি, কেন, এ লেখা সকলের আমার মত ভাল লাগে না। যথার্থই আপনার লেখার tonetটা কবির মত। abstract ভাবের কবিতা যে সব লোকের ভাল লাগে না, তাদেরই আপনার লেখা ভাল লাগে না একথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

যে সব কবিতায় বা ছোটগল্পে অনেক fact আছে, ঘটনা আছে, ভাবটা নিতান্ত সাদাসিদা সাংসারিক, আমি দেখিয়াছি বেশী লোকেরই তা ভাল লাগে, তারা সেটা বোঝে ভাল, কেন না বোঝা সহজ। এইখানে আরো একটা কথা বলি। অনেক দিন পূর্ব্বে বসুমতী কাগজে আপনার 'বিন্দু'র সমালোচনা(?) করিয়া বলে, "হিন্দুর বিধবার রাত্রে আর এক বাড়িতে যাওয়া, কি রুচি, ইত্যাদি ইত্যাদি"। আমার এক বন্ধু এই সমালোচনার কথাটা আমাকে জানান—আমি নিজে ঠিক কথাগুলা দেখি নাই। সেইটা শুনিয়া একবার আমার মনে হয় এই লোকটার স্পর্দ্ধার মত আমিও একটা কঠিন প্রতিবাদ করিয়া কোন কাগজে ছাপাইয়া দিই—আমার মনে হইয়াছিল বলিব এবং খুব কড়া করিয়াই বলিব, "লেখকের রুচি খুব ভাল, শুধু তুমি গোঁড়া এবং নির্ব্বোধ তাই ইহাতে দোষ দেখিয়াছ"। বিন্দুর অপরাধটা যে কি আমি তাহা ত কোনমতেই ভাবিয়া পাইলাম না। সে বেচারা আর একটা নিতান্ত নিরুপায় হতভাগা সঙ্গীকে রাত্রিতে লুকাইয়া দেখিতে গিয়াছিল, যদি আবশ্যক হয়, এক ফোঁটা মুখে জল দিবে কিম্বা এম্‌নি একটা কিছু করিবে—এই ত। এইতেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল। হয়ত বা মনে মনে একটু স্নেহও করিত—খেলার

সঙ্গী—ইহা কি দোষের না রুচিবিগর্হিত? কারণ, সে বিধবা—অর্থাৎ, হিন্দুর বিধবার সুমুখে কেউ যদি মরে, আর সে যদি একটা আঙুল দিয়া স্পর্শ করিলেও সে বাঁচে, হিন্দু বিধবা তাও যেন না করে—যেহেতু সে বিধবা এবং যে লোকটা মরিতেছে সে পরপুরুষ! এই ইহাদের হিন্দু বিধবার আদর্শ!

মনে হয়, লোকগুলা এতটাই সঙ্কীর্ণ মন লইয়া পরের দোষ দেখাইবার স্পর্দ্ধা করে এবং দেখায়, এবং লোকে সেই সমালোচনা পড়িয়া বলে "ঠিক ত! ঠিক কথাই বলিয়াছে!"

আমি ঠিক বলিতে পারি না সমালোচনা কিরূপ ছিল, যেমন আমার বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি সেইমত বলিলাম। আপনি নিজে হয়ত এই সমালোচনা দেখিয়াছেন।

আবার কতকগুলো পাঠকে মনে করে, যেখানে সেখানে জপতপ আর সন্ন্যাসী আর হিন্দু ধর্ম্মের বড় বড় কথা না থাকিলে সে গল্প বা উপন্যাস কোন মতেই ভাল হইতে পারে না।

আপনি লিখুন দেখি কোন বিধবার বিবাহ হইয়াছে—আপনার আর রক্ষা থাকিবে না—মার্ মার্ শব্দ করিয়া সব ছুটিয়া আসিবে। আর এই লোকগুলা নিতান্ত বেহায়া গালিগালাজ করিতে বিশেষ পটু, সেইটাই ইহাদের জোর—অর্থাৎ এরা চীৎকার করিয়া এবং গায়ের জোরে জিতিবার চেষ্টা করে এবং জিতিয়াও যায়।

দিন দিন আমাদের সাহিত্য যেন একেবারে এক ছাঁচে ঢালা গোছ হইয়া উঠিতেছে—প্রতি দিন সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। (তাই এক এক [বার] আমার মনে হয়, উচ্ছৃঙ্খল লেখা লিখিতে সুরু করিয়া দিব—কেবল রাগের উপরেই যা-তা লিখিয়া ফেলিব।) আমি কিছু দিন পূর্ব্বে আমার দিদির নামে "নারীর মূল্য" বলিয়া একটা প্রবন্ধ লিখি। আমার দিদি ব্যাপারটা আমাকে চিঠিতে লিখিয়া পাঠান আমি সেইটাকে বড় করিয়া লিখি। এজন্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা কত যে আমাকে চোখ রাঙাইয়াছেন তাহা লিখিয়া জানান যায় না। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছিলেন, আমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন—ঠিক হিন্দু নই। অথচ, হিন্দুধর্ম্মকে আমি এক তিলও কটাক্ষ করি নাই ইহার গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছিলাম মাত্র। কত লোকে কত সমালোচনা (ভয়ানক প্রতিবাদ) করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, অথচ, আজ পর্য্যন্ত কেহই কিছু করিলেন না। সেই সময়ে আমার এক মামা চিঠি লিখিলেন আমি মনে মনে ব্রাহ্ম বাহিরে হিন্দু। অথচ, আমার গলায় তুলসীর মালা আছে, সন্ধ্যাআহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করি না, যার তার হাতে জল পর্য্যন্ত খাই না। (কিছু মনে করিবেন না মণিবাবু, আপনার কাছে এ সব বলা অন্যায়।) আমি যা' তাই শুধু আপনাকে বলিলাম। এ সব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে কত যে গালিগালাজ করিলেন এবং আমি বাহিরে ভড়ং করি বলিয়া শাসাইয়া দিলেন তাহা আর

কত লিখিব। তার পরেই পীড়িত হইয়া পড়িলাম, না হইলে ইচ্ছা ছিল, ঐ রকম করিয়া "ঠাকুর দেবতার মূল্য" এবং "হিন্দুশাস্ত্রের মূল্য" বলিয়া প্রবন্ধ সুরু করিব। যাক্ নিজের কথাতেই চিঠি পূর্ণ করিয়া দিলাম—কেমন আছেন? শরীর সামিল কি? নূতন কিছু লিখিলেন? হাঁ ভাল কথা, যা' লিখিবেন শেষটায় অস্থির (impatient) হইয়া শেষ করিবেন না—এইখানে বোধ করি আপনার দোষ হয়।

আপনার শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটা অনুরোধ যাহাই এই চিঠিতে লিখিয়া থাকি না কেন দোষ লইবেন না—যদি বা কিছু অন্যায় বলিয়াও থাকি তাহা হইলেও।

পুঃ—আপনার ভাষার দু একটা তুচ্ছ খুঁত লইয়া প্রায়ই লোকজনকে হৈ চৈ করিতে দেখি। অবশ্য, আমি নিজে আপনার (ওই খুঁতগুলার) মত লিখি না, কিন্তু, দোষও দেখি না। আপনি জানিয়া শুনিয়াই ঐ ভাষা এবং বানান লিখিতেছেন—বেশ করিতেছেন। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন—শুধু পরের কথায় ছাড়িবেন না। তবে, যদি নিজে দেখেন ওগুলা বদলান আবশ্যক, তখন বদলাইবেন।

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

তখন ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। খোলা জানলাগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বাইরের সামান্য আলো। দিদিমণি একটা জানলার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিলে সুদূর অতীতে—তাদের সংসারের ঘ'টে-যাওয়া ঘটনাগুলির দিকে, আর আমার মন ডুব দিলে সেই অপূর্ব কারুণ্য-রস-সাগরের অতল তলে। মনের মধ্যে ছায়াবাজির মতন দিদিমণি-বর্ণিত মুখগুলো একে একে ভেসে উঠতে লাগল। সদ্য-শ্রুত অতীত দিনের কাহিনীগুলি ধীরে ধীরে আমার মানসপটে এসে জমা হতে আরম্ভ করলে। মনে হতে লাগল, তারা যেন সকলেই আমার চেনা, আমি যেন এই পরিবারেরই একজন। গৃহবিগ্রহের তুমুল আলোড়নে আমি যেন একবার এপক্ষে একবার ওপক্ষে আন্দোলিত হচ্ছি। বাড়ির বয়স্কেরা আমাকে তিরস্কার করছেন, তুই ছেলেমানুষ, এসবের মধ্যে তুই আসিস নি। যা, নিজের লেখাপড়া করগে যা। কিন্তু বয়সে বালক হ'লেও বিধাতার অভিশাপে আমি যে স্থবির, এ কথা কাকে বোঝাই, কি ক'রে বোঝাই! আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন সেই অভিশপ্ত প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অতৃপ্ত আত্মার মতন এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে ওখানে

ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমার মনের কথা কেউ বোঝে না। সেই ঘটনাস্রোতের ওপরে থেকে থেকে জলজল ক'রে তাঁরই মুখচ্ছবি ফুটে উঠতে লাগল, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে এই অপূর্ব কাব্য রচিত হয়েছে। আমি যেন তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বললুম, ছোটমা, এদের মাপ কর, সংসারটাকে রক্ষা কর।

আমি স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলুম তাঁর চুম্বন আমার মস্তক, ললাট ও চক্ষুতে। সেই উপেক্ষিতা আহিতাগ্নিকার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে বাজতে লাগল, তোদের সর্বনাশ হবে, তোদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

তাঁর অভিমানসঞ্জাত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আমার চোখে মুখে এসে লাগতে লাগল।

সেই নির্মম নিস্তব্ধতার মধ্যে বিশুদার ঘরের আড্ডা থেকে কখনও বা একটু হাসির টুকরো, কখনও অসংলগ্ন একখণ্ড উচ্চ রব ছটকে এসে আমাদের তন্ময়তায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিতে লাগল, সে কাহিনী ভেসে গিয়েছে, নিত্য নতুন ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি ক'রে কালস্রোতে ছুটে চলেছে।

সেই ভাবে ব'সে থাকতে থাকতে আমার মাথার মধ্যে সিদ্ধির নেশার মতন চিন্তার তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলুম, আজ যে ঘটনা অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, একদিন নিশ্চিতরূপে তা ভবিষ্যতের গর্ভে বিরাজ করছিল। এই যে আমি আজ এই সন্ধ্যায় অজানা দেশের এক অপরিচিতা নারীর মুখে তাদের গৃহবিগ্রহের ইতিহাস শুনে মুহ্যমানের মতন স্থির হয়ে ব'সে আছি, এ ঘটনাও একদা ভবিষ্যতের গর্ভে নিশ্চিত ছিল। বর্তমান শুধু ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে ঘটনাবলীকে টেনে এনে অতীতের গর্ভে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে।

সময়ের এই নতুন রূপ মনের মধ্যে নানা ভাবে প্রতিফলিত হতে লাগল। চিন্তার সেই তালগোলের মধ্যেও থেকে থেকে বুকের মধ্যে কে যেন চীৎকার ক'রে উঠতে লাগল, কিছু নাই, কিছু নাই, সব ঝুটা হয়।

চিন্তা-সাগরের কোন্ অতলে তলিয়ে গিয়েছিলুম তার ঠিক নেই ; হঠাৎ শঙ্কর চাকর ঘরের বাতি জেলে দিতেই চটকা ভেঙে গেল।

দিদিমণির দিকে চেয়ে দেখলুম, সেই হারগাছা হাতে নিয়ে অস্বাভাবিক এক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চেয়ে আছে, পরিতোষ ঘাড় নীচু ক'রে মেঝেতে যেন

কি দেখছে। আমার চোখে চোখ পড়তে অদ্ভুত এক রকম হাসি হেসে দিদিমণি আবার আরম্ভ করলে—

আমার ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা দু-তিন দিনের তফাতে মারা গিয়েছিলেন। বাবা কর্মস্থান থেকে ছুটি নিয়ে এসে শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে আবার ফিরে গেলেন। যাবার সময় আমার দুই কাকাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, আর এক কাকা বাড়িতে রইলেন আমাদের হয়ে মামলা তদারক করতে, তখনও মামলার কোনও কিনারাই হয় নি।

ভাগ্যে আমরা দূরে চ'লে গিয়েছিলুম! কিন্তু তাতেও কি রক্ষে আছে! আমার দুই কাকা পটপট ক'রে মারা গেলেন। সব ঠাকুরদাদের গুষ্ঠি সাফ হয়ে যাবার পরও কিন্তু ভূষুণ্ডি কাকের মতন বড়মা তখনও বেঁচে রইলেন। তা না হ'লে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি ক'রে?

এদিকে মামলায় মামলায় বিষয় ফাঁক হয়ে গেল। শেষকালে আমার যে কাকা মামলা তদারকের জন্যে বাড়িতে ছিলেন, তিনি তাঁর ঠাকুরমাকে নিয়ে এক ভাড়াটে বাড়িতে গিয়ে উঠলেন, তাঁদের ভরণপোষণের জন্যে বাবা টাকা পাঠাতে থাকলেন। তখন বড়মার বয়স একশো চার বছর। তখনও বুড়ী বেশ শক্ত সমর্থ, উঠে হেঁটে বেড়ায়, নিজের রান্না নিজে করে, রাত্রে একটা বড় গয়নার বাক্স পাশ-বালিশের মতন জড়িয়ে শুয়ে থাকে। এই যে সব গয়না দেখছিস, এ আমাদের ছোট কাকা কিছু কিছু ক'রে আমাদের বাড়িতে চালান ক'রে দিয়েছিল।

কিন্তু বুড়ীর কপালে আরও দুঃখ ছিল, কারণ বড়মা মারা যাবার দিন পনেরো আগে হঠাৎ ছোটকাকা মারা গেলেন। বাড়িতে একটা মাত্র চাকর ছিল, সেই বড়মার জল তোলা, বাজার করা, রান্নার যোগান দেওয়া ইত্যাদি করত। একদিন রাত্রে সে লোকটা বড়মাকে খুন ক'রে গয়নার বাক্স নিয়ে চম্পট দিলে। বাড়িতে দ্বিতীয় লোক নেই, মড়া প'চে ঢোল হয়ে গন্ধ বেরুতে পাড়ার লোক পুলিসে খবর দিলে। তারা এসে মুর্দাফরাশ দিয়ে লাস টেনে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বাবাকে খবর দিলে।

আমার মা বলতেন, ছোটমা তাঁকে বড় ভালবাসতেন, ছোটমার অভিসম্পাতের বিষ তাঁকে লাগবে না। কিন্তু তাও তো হ'ল না ভাই। একে একে আমার ভাইয়েরা পটপট ক'রে ম'রে গেল। বড়দা বিয়ে করলে না,

ছোট্‌কাও তো চলল, মেয়ের দিক দিয়েও যে বংশের চিহ্ন থাকবে, তাও তো হ'ল না।

এই অবধি ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে দিদিমণি বললে, এই কুবেরের ধন আমি আগলে ব'সে আছি ; জানি না, বরাতে কি আছে !

তারপরে একটা গয়নার বাক্স খুলে দু-তিন মুঠো আংটি তুলে নিয়ে বেছে বেছে একটা হীরের আংটি বের ক'রে পরিতোষের ডান হাতের অনামিকায় পরিয়ে দিয়ে দিদিমণি আমাকে বললে, স্থবির, এর মধ্যে থেকে তোর যেটা পছন্দ হয় নিয়ে পর্।

আমার মন তখন অত্যন্ত ভারী হয়ে আছে, আংটির কথা শুনেই আমার নিজের বগ্‌লোস আংটি ও সেই সঙ্গে লতুর কথা মনে পড়ল। আমি বললুম, এখন থাক্ দিদিমণি, আর একদিন দিনের বেলায় দেখে-শুনে বেছে নেব।

এখানে আশ্রয় পেয়ে আমাদের দিনগুলি কাশীর চেয়ে অনেক ভাল কাটতে লাগল। কাশীতে ছিল একটানা জীবন—খাওয়া-দাওয়া, গঙ্গাস্নান ও রাজকুমারীর অঙ্গসেবা। খালি মিষ্টি কথা ও মিষ্টি কাজ—একঘেয়ে একটানা জীবন। রাজকুমারীর ঐন্দ্রজালিক ব্যবহারের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল নিশ্চয়, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বৈচিত্র্য যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, প্রতিদিনের অভ্যাসে তার মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়।

দিদিমণিদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে মনে হতে লাগল, যেন আমরা একটা পরিবারের মধ্যে বাস করছি। বাড়িতে লোক মাত্র তিনজন—বাবুজী, বিশুদা ও দিদিমণি ; কিন্তু সেই ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি এগারোটা অবধি সেখানে গোলমাল হাঙ্গামা হুজ্জুতের অন্ত নেই। এর মধ্যে বড়কর্তা যেদিন দয়া ক'রে বাড়ি ফেরেন, সেদিন তো বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না।

ঘর আলাদা হয়ে যাওয়ায় বড়কর্তা আমাদের ওপরে হাড়ে চ'টে গেলেন। সেই ব্যাপারের পর যতবার সে বাড়িতে আসত, প্রতিবারই অন্তত ঘণ্টাখানেক ধ'রে আমাদের ঘরে এসে হাঙ্গামা লাগাত। পরিতোষ রাগ করলেও প্রতিবারেই আমি তাকে খোশামোদ ক'রে ক'রে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতুম। একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়বার ঠিক পূর্বমুহূর্তে প্রতিবারই সে বলত, তুমি শালা আচ্ছা লোক আছ, লেকিন উও শালেকো ম্যয় জিন্দা গাড় দুঙ্গা—

জন্মজন্মান্তরের শত্রুতা না থাকলে এমন ব্যাপার সম্ভব হয় না। নব্যতন্ত্রের

দার্শনিক আমার এই ইঙ্গিতে হয়তো মৃদু হাসবেন, তার উত্তরে আমিও মৃদু হাসলুম মাত্র।

মাঘ মাস শেষ হয়ে ফাল্গুন প'ড়ে গেল, কিন্তু তখনও সেখানে বেশ কটকটে শীত। এমনই এক দিনে বেলা প্রায় বারোটার সময় রাস্তার ধারের ছাতে ব'সে ফতুয়া সেলাই করতে করতে হাত-পা কাঁপতে কাঁপতে বিশুদা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পরিতোষ ছুটতে ছুটতে এসে বাড়ির ভেতরে খবর দিলে। আমি আর দিদিমণি তখন সংসারের হিসাব লিখছিলুম। সংবাদ পেয়ে সবাই ছুটলুম বার-বাড়িতে। এক মুহূর্তে বাড়িময় হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। পরিতোষ বললে, আমি বাবুজীকে কাশী থেকে ডেকে নিয়ে আসি।

তখুনি টাকাকড়ি নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এমন সময় পরিতোষ বাবুজীকে কাশী থেকে নিয়ে এল। ঘণ্টা-দুই আগে বিশুদার জ্ঞান হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্বর উঠল বোধ হয় একশো পাঁচ ডিগ্রী। জ্বরের ঘোরে সে একরকম আচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে রইল। বাবুজী পরিতোষের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে একরাশ মিকশ্চার ও পেটেণ্ট ওষুধ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি এসেই বিশুদাকে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়তে চ'লে গেলেন।

পরিতোষ বেচারী সারাদিন কিছুই খায় নি। দিদিমণি তাকে টেনে নিয়ে চ'লে গেল খাওয়াতে, আমি আর আহিয়া রুগীর কাছে ব'সে রইলুম।

দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘোর হয়ে এল। সেদিন বিশুদার ঘরে বাইরের লোকজন কেউ নেই। বন্ধুবান্ধবেরা বাইরে থেকেই তার খোঁজ নিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে যে যার ফিরে যেতে লাগল।

ভরত এসে একটা দেওয়ালগিরি জ্বালিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

বিশুদা বুকের ওপর হাত দুটো জোড় ক'রে শুয়ে, মুখে প্রকাশ না করলেও তার যে খুবই কষ্ট হচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সাপের ফোঁসফোঁসানির মতন তার নিশ্বাসের একঘেয়ে আওয়াজ ঘরের মধ্যে গুমরে গুমরে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল। আহিয়া তার শিয়রে ব'সে কপালে বোধ হয় পুরানো ঘি ঘষছে, আর আমি এক পাশে ব'সে নির্নিমেষ নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় বিশুদা চোখ খুলে যেন কাকে খুঁজতে লাগল।

আমি বললুম, বিশুদা, আমি স্থবির। দিদিমণিকে ডাকব ?

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সে বললে, স্থবির! একবার মাকে ডেকে দে তো! ওপরের ঠাকুরঘরে মা আছে, বল্ গিয়ে, বিশুয়া ডাকছে।

তক্ষুনি ছুটে গিয়ে বাবুজীকে ডেকে নিয়ে এলুম। তিনি এসে আবার কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে কোনও কথা না ব'লে চ'লে গেলেন।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদার অসুখ খুবই বাড়াবাড়ি হতে লাগল। আমি, পরিতোষ, দিদিমণি তার কাছে ব'সে কেউ বা বাতাস, কেউ বা মাথায় জলপটি দিতে লাগলুম। এর মধ্যে বাবুজী আর একবার এসে তাকে দেখে গেলেন।

অনেক রাত্রে বিশুদা স্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে দিদিমণি আমাদের জন্যে বালিশ ও লেপ নিয়ে এসে বললে, তোরা আজ এইখানেই শুয়ে পড়্।

পরিতোষটা ছিল অত্যন্ত ঘুমকাতর। এই কয়েক দিনের মধ্যেই বিশুদার সঙ্গে তার একটা আন্তরিক যোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব'লেই সে এতক্ষণ ঘুমোয় নি। দিদিমণি বলামাত্র সে শুয়ে পড়ল, যেমন শোয়া অমনই ঘুম।

দিদিমণি আমাকে বললে, স্থবির, তুইও শুয়ে পড়্। আমি এখুনি আসছি।—ব'লে সে বেরিয়ে গেল।

আহিয়া তখনও বিশুদার মাথার কাছে ব'সে পাঁচ মিনিট অন্তর ন্যাকড়া ভিজিয়ে জলপটি দিয়ে চলেছিল। খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে আমি বললুম, আহিয়া, এবার তুমিও শুয়ে পড়।

আহিয়া করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে কি যেন বললে, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন শব্দই বেরুল না।

আমার চোখে ঘুম নেই, ব'সে ব'সে ভাবছি, দিদিমণি এলে শোওয়া যাবে। চারিদিক নিস্তব্ধ; বিশুদার নিশ্বাসের সেই সাঁ-সাঁ আওয়াজও ক'মে গিয়েছে, অতীত দিনের অনেক ঘটনার কথা হাল্কা ভাবে মনের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ দিদিমণির অপেক্ষা ক'রে ক'রে একটা বিড়ি ধরিয়ে ছাতে বেরিয়ে গেলুম।

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, বাইরে ঘন অন্ধকার। শুধু বিশুদার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে একটু আলোর টুকরো ছাতে এসে পড়েছে—বিরাট কালো ফ্রেমে বাঁধানো ছোট একখানা ঘষা আয়নার মতন। মেঘবিহীন আকাশে তারা ঝকঝক

করছে, হাওয়া না থাকলেও কনকনে ঠাণ্ডা। আমি মাথা অবধি র‍্যাপারটা মুড়ি দিয়ে এক জায়গায় উবু হয়ে ব'সে পড়লুম।

ব'সে ব'সে ভাবছি আকাশ-পাতাল, হঠাৎ মনে হ'ল, ছাতের আলসের ওপর একখানা হাত ছড়িয়ে তার ওপরে মাথা রেখে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। যে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাপড় পরবার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল, যেন সে নারী। কিন্তু সে রোগা কি মোটা, কালো কি ফরসা তা সেই অন্ধকারে কিছুই ধরবার জো নেই। সে দৃশ্য দেখে ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনের মধ্যে সাহস সঞ্চয় ক'রে ডাক দিলুম, দিদি, দিদিমণি!

কিন্তু ওপক্ষ থেকে কোনও জবাব এল না। অথচ সে মূর্তি ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

এবার বুকের মধ্যে ভয়ানক ঢিপঢিপ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। একটু দূরেই, দিদিমণির ঘরের কাছেই পাহারাদার ব'সে আছে; কিন্তু তাকে ডাকবার ক্ষমতাও রহিত হয়ে গেল। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার ঠিক বর্ণনা করা যায় না। বাবার মারের ভয়, ক্লাস প্রমোশন না পাওয়ার ভয়, ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক রকম ভয়ের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ ভয়ের তুলনায় সেসব কিছুই নয়। কয়েক হাত দূরেই ঘরের দরজা খোলা রয়েছে, কিন্তু উঠে যে সেখানে চ'লে যাব সে শক্তি নেই। পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মত আমি অনড় হয়ে ব'সে রইলুম। এক মুহূর্ত একটা যুগের মতন মনে হতে লাগল। চোখের সামনে দেখলুম, সে মূর্তি দ্রুত চ'লে গেল বিশুদার সকাল-বেলাকার আড্ডার ছাতের দিকে। আর দেরি না ক'রে আমি ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে লেপের তলায় ঢুকে হাঁপাতে লাগলুম।

ওই রকম ধড়মড় ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে আহিয়া একটু সন্দেহদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে বিশুদার শিয়র থেকে উঠে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

ততক্ষণে আমার মনে সাহস ফিরে এসেছে। লেপখানাকে বাগাতে বাগাতে বললুম, কিছু না, বড্ড শীত লাগছে।

আহিয়া আমার কাছ থেকে উঠে গিয়ে বিশুদার শিয়রে বসতে না বসতে দিদিমণি এসে উপস্থিত হ'ল, পেছনে ভরত চাকরের কাঁধে বালিশ ও লেপ। আমার পাশেই বালিশ ও লেপ রেখে ভরত বেরিয়ে গেল। একবার বিশুদার

কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ দেখে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে সে আমার পাশে এসে বসল।

আমার ঘুম ছুটে গিয়েছিল, এবার উঠে বসলুম। আমাকে বসতে দেখে দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, কি রে, এখনও ঘুমোস নি?

কিছুতেই ঘুম আসছে না দিদি।

আচ্ছা, তুই শুয়ে পড়্, আমি তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, এখুনি ঘুমিয়ে পড়বি।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদিমণি, একটু আগে কি তুমি ছাতের কোণে দাঁড়িয়ে ছিলে?

কই, না তো! আমি তো এতক্ষণ বাবুজীর কাছে ব'সে ছিলুম।

ঠিক ভয় না হ'লেও সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

দিদিমণি একবার আহিয়ার দিকে চেয়ে নিয়ে ফিসফিস ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কেন রে, কিছু দেখেছিস নাকি?

বললুম, হ্যাঁ।

দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েমানুষ?

বললুম, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পাথরের মতন স্থির হয়ে ব'সে থেকে সে বললে, ছোট্‌কা তা হ'লে আর বাঁচবে না। কেউ মারা যাবার আগেই ও দেখা দেয়।

ভয়ে দু হাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরলুম।

দিদিমণি আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ভয় কি! তোর কিছু ভয় নেই, বরঞ্চ তোর ভালই হবে, দেখে নিস।

দিদিমণি পাশে শুয়ে আমার লেপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ও কে দিদিমণি?

দিদিমণি আমার কানে ফিসফিস ক'রে বললে, ছোট্‌ঠাকুরমা!

* * *

বোধ হয় দু-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলুম। ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে দেখি, দিদিমণি আমার পাশে ব'সে, এরই মধ্যে তার স্নান হয়ে গিয়েছে, শুধু বসনাঞ্চল গায়ে জড়ানো। আমি উঠতেই আমার হাত ধ'রে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে

দু-খানা দশ টাকার নোট দিয়ে বললে, এ টাকাটা তোর কাছে আলাদা ক'রে রেখে দে। বিশুর জন্যে বাবা বিশ্বনাথের কাছে মানত করেছি।

নোট দুটোকে মুড়ে ট্যাঁকে গুঁজে আবার এসে লেপের তলায় লম্বা হয়ে পড়া গেল।

সেদিন সকালেও বিশুদার অবস্থা সেই রকমই রইল। বাবুজী সেদিন আর বেরুলেন না। পরিতোষ বিশুদার সেবা করতে লাগল মায়ের মতন। সকাল থেকে তাকে 'বেডপ্যান' দেওয়া, মাথায় জলপটি লাগানো, ঠায় ব'সে থেকে সে রোগীর পরিচর্যা করতে থাকল। শেষকালে দিদিমণি এক সময়ে এসে তার হাত ধ'রে তুলে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে আমাদের ঘরে শুইয়ে দিলে।

আমরা মনে করেছিলুম, এ যাত্রা বিশুদার আর রক্ষে নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাবুজীর দাওয়াইয়ের গুণেই হোক অথবা তার জীবনীশক্তির জোরেই হোক, দিন তিনেকের মধ্যেই তার জ্বর একেবারে নেমে গেল। সাত-আট দিন পরে আবার সে সকালবেলায় লাঠি আঁকড়ে নেংচে নেংচে গিয়ে ছাতের আড্ডায় বসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। অবিশ্যি সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত জ্বর আসা বন্ধ হ'ল না বটে, তবে টুপি-সেলাই ফতুয়া-সেলাই সেই আগের মতই চলতে লাগল।

তারপর একদিন, ফাল্গুনের মাঝামাঝি হ'লেও তখনও বেশ শীত, তবুও মধুমাসের আগমনী সঙ্গীতে প্রকৃতির অঙ্গে শিহরণ আরম্ভ হয়েছে মাত্র, দিদিমণি আমায় ডেকে বললে, স্থবির, আমরা কাল সকাল আটটার গাড়িতে কাশী যাব বাবার পূজো দিতে, মনে আছে তো? তুই, আমি আর পরিতোষ এই তিনজনে যাব। সারাদিন কাশীতে থেকে রাত্রি সাড়ে আটটার গাড়িতে ফিরব। বাবুজী আসবার ঘণ্টাখানেক আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব। আজ রাতে আমি বাবুজীকে ব'লে রাখব 'খন।

সন্ধ্যেবেলা বিশুদার ঘরে ব'সে কাশী যাবার পরামর্শ হতে লাগল। এ কথা সে কথার পর হঠাৎ বিশুদা দিদিমণিকে বললে, তুই আর শর্মাজী কাশী যা, রায়সাহেব এখানে থাক্, সারাটা দিন একলা থাকব, কি বল পরিতোষ?

ঠিক হ'ল, আমি আর দিদিমণি কাশী যাব, পরিতোষ বাড়ি থাকবে। সে-রাত্রে পরিতোষ বললে, একবার তোর রাজকুমারীর কাছে গিয়ে জয়ার খোঁজটা নিয়ে আসিস।

আমি বললুম, জয়াগিন্নী বলেছিল যে, তাদের ফিরতে ছ মাস লাগবে, তার ছ মাসও এখনও কাটে নি। তার ওপরে ওই ব্যবহারের পর আর কি সেখানে যাওয়া ঠিক হবে?

পরিতোষ কিছুক্ষণ চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে রইল। তারপরে বললে, ঠিক বলেছিস। ও মাগীর বাড়িতে আর যাস নে। মাস ছয়েক কেটে গেলে জয়াকে চিঠি লিখব; সে এখানে চ'লে আসবে।

আবার কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থেকে সে বললে, জয়ার কথা আমি দিদিমণিকে ব'লে ফেলেছি।

বেশ করেছ।

পরিতোষের কথাটা শুনে মনে একটা তীক্ষ্ণ আঘাত পেলুম। সে যে দিদিমণিকে জয়ার কথা ব'লে ফেলেছে, ঠিক সেজন্যে নয়। কিন্তু দিদিমণি এ কথা ঘুণাক্ষরেও কোন দিন আমার কাছে তা প্রকাশ করে নি, সেইজন্যে তার ওপর আমার দারুণ অভিমান হতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর জিজ্ঞাসা করলুম, আর কিছু বলেছিস নাকি? রাজকুমারীর কথা বলিস নি তো?

পরিতোষ বললে, সব বলেছি।

রেগে-মেগে ব'লে ফেললুম, দূর শালা! এসব বলতে গেলি কেন?

পরিতোষ হাসতে লাগল।

পরদিন সকালবেলা একটা টিনের হাতবাক্সের মধ্যে দিদিমণি ও আমার কাপড়, গামছা, তেলের শিশি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে দুখানা টিকিট কিনে একটা খালি সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় গিয়ে উঠলুম। আমি স্টেশনের দিকে আর দিদিমণি অন্য দিকের বেঞ্চিটা দখল ক'রে ব'সে পড়লুম। একটু পরেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গিয়েছে। মুখর মহানগরী কলিকাতার কোলাহল স্তব্ধ। এমনই এক রাত্রে জাতক লেখা শুরু করেছিলুম। ভাবছিলুম, এই সামান্য কয় বৎসরে জগতের কত পরিবর্তনই না হয়ে গেল! আজই সকালে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, এক বর্বর জাতি আর এক বর্বর জাতির দেশে অ্যাটমিক বোমা ফেলে এক মুহূর্তের মধ্যে একটা শহর একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। এতখানি নৃসংশতা, মূঢ়তা ও কাপুরুষতার নিদর্শন প্রাকৃতিক

বিপ্লবের ইতিহাসেও দুর্লভ। এই কথাটাই মনের মধ্যে জলজল করছিল, এমন সময় স্মৃতি-সাগরের গর্ভ থেকে সেই দিনের সকালবেলাটি অপূর্ব এক রূপ ধ'রে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল—তার স্বরূপ বাণীমূর্তি গঠন আমার সাধ্যাতীত।

রেলগাড়ি ছুটে চলেছে, স্তব্ধ ধরণীর বুকে অর্থহীন প্রলাপের নিরবচ্ছিন্ন ঝঙ্কার তুলে। জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আমি ব'সে আছি। কাশীর কথা, কাশীর অভিজ্ঞতার কথা ভাবছি, ভাবছি নিজের ভবিষ্যতের কথা। এমন সময় দিদিমণি ডাক দিলে, ওখানে কেন, এখানে আয়, একটু গল্প করি।

এদিক থেকে উঠে গিয়ে দিদিমণির বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। সে আমার দিকে একটু স'রে এসে বললে, দেখ, কাশীতে গিয়ে কিন্তু এক্কায় চড়তে হবে, আমার এক্কা চড়তে ভারি ভাল লাগে। সেই কবে ছেলেবেলায় বেরিলিতে থাকতে এক্কায় চড়তুম, আর চড়া হয় নি।

বললুম, এক্কায় উঠবে কি ক'রে? প'ড়ে যাবে না? বাঙালীর মেয়েকে তো কখনও এক্কায় চড়তে দেখি নি।

দিদিমণি হাসতে হাসতে বললে, পড়ব কেন রে! দেখ্ না তুই, কেমন চড়ি। শুধু চোখ রাখবি, বাবুজী বা আমার বড় ভাই না দেখতে পায়। তা হ'লে ভারি লজ্জায় পড়তে হবে।

তারপরে সে গড়গড় ক'রে বলতে আরম্ভ করলে, দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে স্নান সেরে আগে ছোট্‌কার পূজো দিতে হবে। তারপরে খাবার-দাবার কিনে নৌকো ভাড়া করব, নৌকোতে ব'সে খেয়ে নিয়ে রামনগরে যাব। সেখানে রাজবাড়িতে গিয়ে সব দেখে-শুনে কিছুক্ষণ গঙ্গায় ঘুরে বেড়িয়ে যাব চৌকে। সেখানে ভাঙ খেয়ে যাব বড় গৈবিতে, সেখান থেকে স্টেশনে ফিরে চ'লে আসব বাড়িতে, বুঝলি!

আমি বললুম, দিদি, ভাঙ আমার সহ্য হয় না, বড্ড বুক ধড়ফড় করে।

আমার কথা শুনে অভয়-হাসি হেসে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে দিদিমণি বললে, দূর পাগলা, কিচ্ছু হবে না, আমি আছি।

রেলগাড়ি ছুটে চলেছে শব্দের তুফান তুলে, তার চেয়ে দ্রুত চলেছে আমার জীবনের ঘটনাস্রোত, মনের মধ্যে তারই আন্দোলন চলেছে। একটার পর একটা স্টেশন আসছে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, প্রতি স্টেশনেই থামে।

আমরা দুজনে পাশাপাশি ব'সে বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিয়েছি। দূরে পাহাড়, গাছ, গ্রাম সবই বিপরীত দিকে ছুটেছে, মাঝে মাঝে চোখে কয়লার কুচি প'ড়ে যতিভঙ্গ হচ্ছে।

এই রকমে সময় কাটছে, হঠাৎ দিদিমণি জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বললে, আচ্ছা স্থবির, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

কর।

না থাক্, তুই হয়তো রাগ করবি।

বললুম, না, রাগ করব না, সত্যি বলছি, রাগ করব না, বল তুমি।

দিদিমণি কিন্তু কোন কথা না ব'লে আবার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিলে। চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে লাগলুম, কি কথা বলতে গিয়ে এমন ক'রে সে চেপে গেল! মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকা, এ হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক ধর্ম, এ বিষয়ে দিদিমণি ও দিদিমাতে কোনও তফাত নেই।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর অর্থাৎ আমার কৌতূহল যখন চরমে উঠেছে, জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, মনে কর, আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে উঠেছি, এমন সময় দেখা গেল, তোর রাজকুমারীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সে যদি বলে, স্থবির, আমার সঙ্গে চ'লে আয়। তা হ'লে? তা হ'লে তুই চ'লে যাবি তো?

আমি বললুম, পরিতোষের কাছে তুমি কি শুনেছ তা জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে, তুমি আমায় বিশ্বাস কর না। বিশ্বাস কর, রাজকুমারী যদি আজ এসে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে বলে, তুই আমার কাছে ফিরে আয়, তো আমি তার সঙ্গে কথা না ব'লে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাব। আমাকে বিনা কারণে সে যা অপমান করেছে, তার শোধ তা হ'লে আজই হয়ে যাবে।

আমার কথা শুনে দিদিমণি যেন আশ্বস্ত হয়ে আবার প্রশ্ন করলে, তা হ'লে তুই তাকে ভালবাসিস না?

আমি তাকে ঘৃণা করি।

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, লতুকে কি এখনও ভালবাসিস?

এ কথার কি জবাব দেব! আমার জীবনের প্রথম প্রেম সে। আজও জীবনশেষে যার কথা মনে হ'লে মনে হয়, আমার জীবন ব্যর্থই হয়েছে। সেদিন তখনও সেই ক্ষত বুকের মধ্যে দগদগ করছে, হঠাৎ সেখানে খোঁচা লাগতেই কে যেন আমার টুঁটি টিপে দম বন্ধ ক'রে দিতে লাগল। দিদিমণি একটা হাত দিয়ে আমার হাত ধরেছিল, সেই হাতে আমার অশ্রুজল ঝরঝর ক'রে পড়তে লাগল।

আমাকে কাঁদতে দেখে সে আমাকে এক রকম জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগল, আমার মাপ কর্। লক্ষ্মী ভাই আমার, কাঁদিস নি। আমি জানি, আমি জানি—

দিদিমণি কাঁদতে কাঁদতে নিজের বসনাঞ্চল দিয়ে আমার অশ্রু মুছিয়ে দিতে লাগল। একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সহানুভূতিতে তার মুখখানা থমথম করছে, দু চোখে করুণার প্রস্রবণ ব'য়ে চলেছে।

দিদিমণি বলতে লাগল, দেখ্ ভাই, ভালবাসা সকলের ভাগ্যে সহ্য হয় না। আমার কথাই একবার ভেবে দেখ্। আমার সেই আধপাগলা স্বামী, মাত্র কয়েক দিনের জানাশোনা তার সঙ্গে। তবুও ভগবান যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখতেন—

এই অবধি ব'লে সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

দুটো তিনটে স্টেশন এই ভাবেই চ'লে গেল।

দিদিমণি মুখ তুলে বলতে আরম্ভ করলে, আমার অবস্থা তো দেখছিস? ছোট্কা তো চলল। বাবুজী আর কদিনই বা আছেন! বড় ভাইটা তো জানোয়ারের অধম, সে তার বিষয়-আশয় আলাদা ক'রে নিয়েছে। বাবুজী গেলেই তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে যাবে। তারপর, আমার কি হবে? কোন্ বিদেশে কোথায় কি ভাবে মরব, মুখে একটু জল দেবার লোকও থাকবে না কাছে। স্থবির, স্থবির ভাই, আমাকে ছেড়ে যাস নে, আমি বড় অসহায়।

দিদিমণি আমার হাত ধ'রে নিঃশব্দে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আমি বললুম, দিদিমণি, আমি যতদিন আছি, তোমার কোনও ভয় নেই। তোমাকে ছেড়ে আমি কখনও কোথাও যাব না, তুমি বিশ্বাস কর।

আজ জীবনশেষে হিসাব ক'রে দেখছি, সারা জীবন ধ'রে যত প্রতিজ্ঞা করেছি, সরল মনেই করেছি। প্রতিজ্ঞাপূরণের ভার যার ওপর ছিল, সেই করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। আমি নির্দোষ।

আমার কথা শুনে দিদিমণি স্থির নেত্রে আমার দিকে চাইলে। কাঁদতে কাঁদতে তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল, তবুও দেখে বুঝতে পারলুম, সে চোখে কি আশ্বস্তি! কিছুক্ষণ আমাকে এক রকম জড়িয়ে ধ'রে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ব'সে শেষকালে আমার উরুতে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়ল।

জীবন-প্রভাতের সেই মধুময় স্বপ্ন আজ এক বিচিত্র রূপ ধ'রে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কোন্ ভাষায় আমি তাকে রূপ দান করব!

কাশীর ক্যান্টন্‌মেণ্ট স্টেশনে যখন গাড়ি পৌঁছল, তখনও আমরা নিজের চিন্তায় বিভোর। লোকজনের ওঠানামা ও ফেরিওয়ালাদের চীৎকারে চটকা ভেঙে গেল। আমরা নেমে স্টেশনের বাইরে এসে ভাল দেখে একখানা এক্কা ভাড়া করলুম দশাশ্বমেধ ঘাট অবধি। ভাড়া ঠিক হ'ল তিন আনা। তখনকার দিনে সিকরোল থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট অবধি এক্কার ভাড়া ছিল ছ পয়সা, বড় জোর দু আনা। দিদিমণি বললে, যাকগে, এইটেই ঠিক কর্, এক্কাটা ভাল আছে।

দিদিমণি এক লাফে এক্কায় চ'ড়ে চাদরে মাথা ঢেকে বসল, আমি এক দিকে পা ঝুলিয়ে বসলুম।

এক্কাওয়ালাটা ছিল অল্পবয়সী। দিদিমণিকে দেখে বোধ হয় তার 'ফিলিংস' চাগল, এক্কা চালাতে চালাতে সে ব্যক্তি তারস্বরে চীৎকার ক'রে পিরীতের গজল গাইতে শুরু ক'রে দিলে। লোকটা বোধ হয় মনে করেছিল, তার গানের ব্যঞ্জনা আমরা বুঝতে পারব না। অবশ্য সে গানের বাচ্যার্থ বোঝবার মতনও ভাষাজ্ঞান আমার আয়ত্ত হয় নি, কিন্তু দিদিমণি যে তার সমস্ত কথাই বুঝতে পারছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একবার তার দিকে চেয়ে দেখি যে, তার মুখখানা রাগে রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে। গায়ক বোধ হয় তার রাগকে অনুরাগ মনে ক'রে একএকটা পংক্তি ইনিয়ে বিনিয়ে গেয়েই বারে বারে পেছন ফিরে দেখতে লাগল, সেই সুন্দরী সোয়ারীর ওপর তার কণ্ঠস্বর কি রকম প্রভাব বিস্তার করছে!

যা হোক, এমনই ক'রে পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে তো দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে পৌঁছনো গেলে।

গাড়ি থেকে নেমে হাত-বাক্সটি নামিয়ে নিয়ে রাস্তার এক ধারে দাঁড়ালুম,

দিদিমণি তার গেঁজে থেকে একটা ছোট রূপোর দু-আনি আর চারটে পয়সা আমার হাতে দিলে—'আনি' জিনিসটির তখনও জন্ম হয় নি।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে এক্কাওয়ালাকে পয়সাগুলো দিয়ে দিদিমণির কাছে এসে দাঁড়ালুম। এক্কাওয়ালা সেগুলো গুনে দেখেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে আমার পিছু পিছু এক রকম ছুটে এসে বললে, এ বাবু, এ কি দিচ্ছ! পাঁচ আনা ভাড়া ঠিক ক'রে এখন তিন আনা দিচ্ছ কেন?

আমি বললুম, তোমার সঙ্গে তো তিন আনা ভাড়া ঠিক হয়েছিল!

কিন্তু এক্কাওয়ালা এমন ষাঁড়ের মতন চেঁচাতে লাগল যে, লোক দাঁড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শেষকালে দিদিমণি আমাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সামনে এসে বললে, কি বলছিস তুই?

লোকটা দিদিমণিকে কি একটা কথা বলামাত্র ঠাস ক'রে একটি চড় পড়ল তার গালে, দেখতে না দেখতে আর একটি চড়—

মেয়েমানুষ, বিশেষত বাঙালীর মেয়ে, জোয়ান পুরুষ মানুষের গালে এমন বেপরোয়া চড় লাগাতে পারে এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

দেখতে দেখতে চারিদিক লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, একটু দূরেই একজন কন্‌স্টেব্‌ল দাঁড়িয়ে ছিল, হাঙ্গামা দেখে সে ছুটে আসতেই দিদিমণি তাকে উর্দূতে কি বললে। তার কথা শুনেই সে এক্কাওয়ালার কাঁধে মারলে একটি জোর ঘিস্‌সা, লোকটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে নিজের গাড়িতে চ'ড়েই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে গেল।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে কাপড় ছেড়ে আমরা চললুম দিদিমণিদের পাণ্ডার বাড়িতে। পাশেই, মানমন্দিরের ঘাটের কাছেই ছিল তাদের পাণ্ডাবাড়ি। দিদিমণি সেখানে যেতেই বাড়িতে হৈ-হৈ উৎসব লেগে গেল। পাণ্ডাবাড়ির মেয়েমহলেও দেখলুম তার খুবই প্রতিপত্তি। বৃদ্ধ পাণ্ডা মহারাজ চীৎকার করতে লাগলেন, আজ আমার বরাত ভাল, আজ মনোরমা মায়ি এসেছে—

যা হোক, আদর-আপ্যায়নের পর পুজো দিতে চললুম। পাণ্ডাজী গর্ভগৃহ থেকে একেবারে ভিড় সরিয়ে দিয়ে দিদিমণির পুজো দেওয়ালে। পুজো সাঙ্গ হয়ে যাবার পর পাণ্ডা মহারাজ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ তখনও সেখানে উপস্থিত

রয়েছে। দিদিমণি আমার একখানা হাত ধ'রে টেনে এনে বললে, ঠাকুরের মাথায় হাত দে।

তার কণ্ঠস্বর শুনে আমি দস্তুরমতন ভড়কে গেলুম।

দিদিমণি কঠিন সুরে বললে, দে, হাত দে ঠাকুরের মাথায়।

আমি সারাজীবন ধ'রে বহুবার লক্ষ্য করেছি, অতি আপনার জনও মাঝে মাঝে এমন দুর্বোধ্য, রহস্যময় ও কঠিন হয়ে ওঠে, যার হদিশ পাওয়া মুশকিল। অনন্যোপায় হয়ে ভয়ে ভয়ে শিবলিঙ্গের ডগায় দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাকে চেপে ধরলুম।

দিদিমণি বললে, সৌগন খা (ভাষাজ্ঞান কিছু অগ্রসর হবার পর জেনেছি, এর মানে, শপথ কর্), আমাকে ছেড়ে কখনও যাবি নে।

বললুম, তোমাকে ছেড়ে কখনও যাব না। পাণ্ডা মহারাজ হাসতে হাসতে বললে, ছেলেটাকে পুষ্যি নিলি বুঝি মনো মায়ি? বড় সুলক্ষণ ছেলে আছে।

আজ সেই সব কথা মনে হয়ে বুকের মধ্যে একটা অট্টহাসি গুমরে উঠছে, আর মনে পড়ছে বিশ্বকবির বাণী, সব ঝুটা হ্যয়।

দিদিমণি পাণ্ডাজীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে আমার হাত ধ'রে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল।

আমরা ঠিক করেছিলুম, বাজার থেকে খাবার কিনে বজরায় ব'সে খাওয়া হবে, কিন্তু পাণ্ডা মহারাজ কিছুতেই ছাড়লে না। সে এক রকম জোর ক'রে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভূরিভোজন (অবশ্য নিরামিষ) করিয়ে ছেড়ে দিলে। বেলা তখন প্রায় বারোটা।

পাণ্ডার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মানমন্দিরের ঘাট থেকে আমরা একখানা বজরা ঠিক করলুম। প্রথমে আমাদের রামনগরে নিয়ে যাবে, সেখানে আমরা ঘণ্টাদুয়েক থাকব। তারপর বেলা চারটে অবধি অসি ঘাট থেকে রাজঘাট অবধি ঘুরিয়ে এনে আবার মানমন্দির ঘাটে নামিয়ে দেবে। যতদূর মনে পড়ছে, ভাড়া ঠিক হয়েছিল বারো আনা।

এর আগে কাশীতে এতদিন কাটিয়েছি, ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারে রামনগরের সাদা প্রাসাদ কতদিন দেখেছি, কিন্তু সেখানে যাবার সৌভাগ্য কোন দিনই হয় নি।

রামনগরের রাজা, তিনি তখনও মাত্র 'কাশী-নরেশ'ই ছিলেন। তিনি

তখনও মহাঅমাত্য (মহামান্য) ইংরেজ রাজের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হন নি। কিন্তু একদিন যে তাঁরা প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, তা প্রাসাদের কাছাকাছি এলেই বুঝতে পারা যায়।

প্রকাণ্ড দরজা, যেমন উঁচু তেমনই চওড়া। দরজার দু দিকে গাদা-বন্দুকধারী শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে, অনেকটা পুরানো দিনের তাসের রাজার মতন চেহারা তাদের। কিন্তু প্রাসাদের দরজা অবারিত, রাজ্যের লোক ঢুকছে বেরুচ্ছে, কেউ কারুকে বারণ করছে না। সিংহ-দরজা পেরিয়েই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, সেখানে দুটো-তিনটে মহাকায় বাঁধা রয়েছে। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে উঁচু নীচু সরু মোটা গলিপথ দিয়ে প্রায় গঙ্গার ধারে শিবের মন্দিরে এসে পৌঁছলুম। দিদিমণি গলবস্ত্র হয়ে এক-একটি দেবতাকে প্রণাম করলে। একটা মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে মস্তবড় একখানা তৈলচিত্র টাঙানো রয়েছে দেখলুম। ছবিখানা দেখেই আমার কৌতূহল জাগল। মন্দিরের মধ্যে ঢুকে সেটা ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ছবিখানা প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে বুঝতে পারা যায়, সেটা একজন সন্ন্যাসীর ছবি।

দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করলুম, এটা কার ছবি?

দিদিমণি বললে, ব্যাসদেবের।—ব'লেই সে গলবস্ত্র হয়ে ছবির উদ্দেশে একটা গড় করলে।

দিদিমণির কথা শুনে আমার হাসি পেল। বললুম, দূর, ব্যাসদেবের ছবি না আরও কিছু!

কাছেই মন্দিরের পুরোহিত গোছের এক ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে ছিল, সে দিব্যি বাংলায় বললে, হাঁ হাঁ বাবু, মা যা বলছেন, তা ঠিকই আছে, উনি ব্যাসদেবই আছেন।

আমি বললুম, ব্যাসদেবের ছবি কোথায় পেলে! কোন্ সালে, কত হাজার হাজার বছর আগে ব্যাসদেব জন্মেছিলেন, তার জান কিছু? ব্যাসদেবের ছবি বললেই আমি অমনই মেনে নেব!

ব্রাহ্মণ আমার কথায় রাগ না ক'রে হেসে বেশ মিষ্টি মিষ্টি ক'রে বললে, আপনি বালক হ'লেও বাংগালী তো! বাংগালীরা তো ফিরিঙ্গিদের চেলা আছে, তারা তো ধর্মকর্ম কিছুই মানে না। শুধু মায়েরা আছে ব'লেই তো আপনাদের

ধর্মকর্ম এখনও বজায় আছে। ব্যাসদেব কবে জন্মেছিলেন, আর আর সব বৃত্তান্ত এই মাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি আপনাকে সব বুঝাইয়া দিবেন।

কথাগুলো এক নিশ্বাসে ব'লে ফেলেই লোকটা অত্যন্ত উচ্চহাস্যে পারাবত-কুল চঞ্চল ক'রে এমন একটা মুখভঙ্গী ক'রে আমার দিকে চাইলে, যার জবাব দেবার মতন শক্তি আমার অঙ্গে ছিল না। কাজেই হার মেনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমি ক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিভ হয়ে পড়েছি দেখে দিদিমণি আমার হাত ধ'রে বললে, চল্, গঙ্গার মন্দিরে যাই।

গঙ্গার কোলেই ছোট একটুখানি মন্দির। তারই মধ্যে গঙ্গামূর্তি—মকর-বাহিনী গঙ্গা।

মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দিদিমণি বললে, দেখ্ দিকিন, কেমন সুন্দর মূর্তি!

সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেবেলা থেকে সেদিন অবধি মূর্তিকে আমি স্রেফ 'মূর্তি' ব'লেই দেখে এসেছি। যে সমাজে ও পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল, রূপের মধ্যে অরূপের সঙ্কেত যে থাকতে পারে, তেমন শিক্ষা তাঁদের ছিল না—এমন কথা তাঁদের শত্রুও বলতে পারবে না; কিন্তু যে সংস্কৃত মন (cultured mind) শিক্ষার অপপ্রভাবে রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান পায় সে মন তাঁদের ছিল না। এই কারণে বাল্যকাল থেকে দেব-দেবীর মূর্তিকে মূর্তি ব'লেই দেখতে শিখেছি, সে সুন্দর কি অসুন্দর এ বিচার মনের মধ্যে কখনও উদয়ই হয় নি। দেব-দেবী দেব-দেবীই মাত্র। দেব-দেবীত্ব ছাড়া অন্য কোনও গুণ তাদের প্রতি আরোপিত হতে পারে এমন কথা আমাদের সংস্কারের বাইরে ছিল। শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যবোধের বিচারে কোনও দেব-দেবীর মূর্তিকে দেখবার মতন সাহস আমাদের ছিল না। কিন্তু দিদিমণি সামান্য একটু ইঙ্গিত করা মাত্র যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। কিছুক্ষণ সেই মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল, আহা, কি সুন্দর!

এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, রামনগরের এই মকরবাহিনী গঙ্গা-মূর্তিকে আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ মূর্তিগুলির সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলছি। আমি ভারতের তথাকথিত প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ মূর্তিই স্বচক্ষে দেখেছি। এই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করছি যে, তাদের প্রত্যেকটিকে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলতে আমার বাধা লাগে, দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণ দেশের সুন্দরস্বামীর মূর্তি। এই মূর্তিটি

সম্বন্ধে কত কথাই শুনেছি ও পড়েছি, আচার্য অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব ভাষায় তার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা শোনবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে, কিন্তু আজও মনের দ্বিধা ঘোচে নি। কিন্তু দক্ষিণ দেশের নটরাজ, দিলদারনগরের যক্ষিণী অথবা মহাবলিপুরমের মহিষমর্দিনী কোনও বক্তৃতার অপেক্ষা রাখে না। সে মূর্তি দেখলেই শিল্পসৌন্দর্য প্রকাশ করবার বাচালতা স্তব্ধ হয়ে গিয়ে মন শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে, তার পেছনে কি ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা না জেনেও। রামনগরের এই গঙ্গামূর্তি এদের সমকক্ষ না হ'লেও সে এই জাতেরই মূর্তি, যা দেখলেই মনে হয়, আহা!

যাক, অনধিকার-চর্চা আর করব না। গঙ্গামায়িকে গড় ক'রে আমরা বজরায় এসে বসলুম। বজরা মাঝগঙ্গায় পড়তে দিদিমণি আমার উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। আমার ধুতিখানা ছিঁড়ে গেছে দেখে দিদিমণি ব'লে উঠল, ছি-ছি, আমার তো মনেই ছিল না যে, তোদের ধুতি জামা নেই। কাল সকালবেলা তুই আর পরিতোষ কাশীতে এসে দুজনে ছ জোড়া ধুতি আর চারটে ক'রে শার্ট কিনে নিয়ে যাবি। দুটো তুলোর ফতুয়াও কিনে নিস। দশাশ্বমেধ ঘাটে ওই যে বাঙালীদের বড় দোকান আছে কাপড়-জামার, ওখানে দুজনে দুটো গরম কোটের অর্ডার দিয়ে দিবি।

আমি বললুম, আর তো শীত চ'লে গেল ব'লে। এখন আর গরম কোট দিয়ে কি হবে?

দিদিমণি বললে, সেই ভাল। আসছে বছরে তো আবার তোরা বেড়ে যাবি।

দিদিমণি দুঃখ করতে লাগল, পাণ্ডাজীকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিলুম, বাড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দিলেও চলত। তোদের জামা কাপড় নেই, কথাটা মনেই ছিল না।

শেষকালে যথারীতি আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে দিদিমণি উপসংহার করলে, সব দোষ তোর, তুই কেন আগে আমায় বললি নে, এত কাজের মধ্যে আমার কি সব কথা মনে থাকে!

বজরা ভেসে চলল উত্তরবাহিনীর বুকের ওপর দিয়ে তরতর ক'রে, আর আমরা ভবিষ্যৎ স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলুম, কোথায় কাশ্মীরের অমরনাথ, হিমালয়ের বুকে মানস-সরোবর, কেদার ও বদরীনাথ। কোথায় ভারতের

এক কোণে দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দির, আবু পাহাড় আর রাজস্থানের পুষ্কর, কোথায় জুনাগড় আর কোথায় পুরুষোত্তম! আমি, পরিতোষ, দিদিমণি আর জয়া এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থ ছুটে বেড়াতে লাগলুম।

বেলা প্রায় চারটের সময় বজরাওয়ালা আমাদের মানমন্দিরের ঘাটে নামিয়ে দিলে। সেখান থেকে হেঁটে গোধুলিয়া অবধি গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে প্রথমে আমরা চৌকে গেলুম। দেখলুম, কাশীর সমস্ত রাস্তা-ঘাট দোকানপত্তর দিদিমণির একেবারে নখদর্পণে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

৫

and this defendant further answering saith that the said Juggomohun Roy also after the said partition as aforesaid sold certain lands without the consent or concurrence of this defendant and dealt with such last mentioned lands as the sole and exclusive property of him the said Juggomohun Roy and applied the price or produce of such last mentioned lands to the sole and exclusive use of him the said Juggomohun Roy and this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant by the profits of the Talooks in that behalf in the Complainants Bill mentioned or otherwise greatly or at all increased any joint personal estate in which this defendant and the said Juggomohun Roy were interested or that any such joint personal estate at the death of the said Juggomohun Roy amounted to Five Lacs of Rupees or to any other great amount either including the sum of Eighty thousand Sicca Rupees in ready money or any other sum and this defendant further answering saith that at or any time after the beforementioned partition this defendant and the said Juggomohun Roy were not possessed of or interested in any joint personal estate whatsoever and this defendant further answering saith that on the death of the said Juggomohun Roy or at any time afterwards this defendant did not directly or indirectly possess himself of any ready money or public securities of the Government of Bengal or of any securities of individuals or of any jewels or gold or silver ornaments or of any plate or household furniture or of any other effects of any

kind or description which were of the said Juggomohun Roy in his lifetime or at the time of his death and this defendant further answering saith that he this defendant on the death of the said Juggomohun Roy or at any time afterwards did not directly or indirectly possess himself of and is not now possessed of and hath not at any time kept any Pottahs or title-deeds or muniments or Books or accounts or papers belonging to any estate immoveable or real or moveable or personal which respectively were of the said Juggomohun Roy in his lifetime or in which he had any interest whatsoever and this defendant further answering admits that the said Complainant at the time of the death of the said Juggomohun Roy was an infant of the age of fifteen years or thereabouts and this defendant further answering denies that shortly or at any time after the death of the said Juggomohun Roy this defendant with the joint funds of himself and of the said Complainant or for their joint use and benefit purchased a certain upper roomed house and ground thereunto belonging situate at Chowringhee in the town of Calcutta or elsewhere of the value of Sicca Rupees Twenty thousand or thereabouts or of any other value or that this defendant at any time with the joint funds of himself and of the said Complainants or for their joint use and benefit purchased an upper roomed garden house situate at Simlah in the said town of Calcutta or elsewhere either of the value of Sicca Rupees Thirteen thousand or thereabouts or of any other value But this defendant further answering saith that he this defendant on his own account and with his own separate funds and for his own separate use and benefit did in the year of Christ One thousand eight hundred and fourteen purchase the said last mentioned house and ground at Chowringhee from one Elizabeth Fenwick for the price or sum of Sicca Rupees Twenty thousand three hundred and seventeen and that this defendant in like manner in the year last mentioned purchased the said upper roomed house situate at Simlah from one Francis Mendes for the price or sum of Sicca Rupees Thirteen thousand and that the last mentioned house was also purchased with the proper and exclusive monies of this defendant And this defendant further answering denies that after the death of the said Juggomohun Roy the said Complainant continued to live with this defendant as an undivided Hindoo family at the family house at Nangoorparah or at any other house until the sixteenth day of Maug in the Bengal year one thousand two hundred and twenty three as untruly stated in the Complainants Bill of Complaint and this defendant further answering denies that the said Complainant at or after the time of the death of the said Juggomohun Roy had any joint right with this defendant in or to any estate

or property whatsoever except the right of the said Complainant under the said Deed of Partition to a share of the said house and premises at Nangoorparah as aforesaid until this defendant assigned his interest therein as hereinbefore mentioned

ক্রমশ

পদচিহ্ন

সতেরো

রাধাকান্ত ডায়েরি লিখছিলেন, ১৮ই আশ্বিন শনিবার শুভ সাইত্তের দিন একাদশী। অর্থাৎ বিজয়াদশমীর পরদিন। একাদশীর দিন নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপের সকল শরিকে পৃথক পৃথক শতরঞ্চি-চাদর বিছিয়ে খাতা ও ক্যাশবাক্স সামনে রেখে ব'সে দুর্গাপূজার খরচ-খরচা এবং পার্বণী বৃত্তি দেওয়ার নিয়ম। কিছু পাওনাও আছে। আপন আপন মহলের গোমস্তারা এবং বর্ধিষ্ণু প্রজারা কেউ এক টাকা, কেউ আট আনা দিয়ে প্রণাম ক'রে যায়। নিজেদের দৌহিত্র-গোষ্ঠীর সক্ষম জনেরাও পূজার প্রণামী হিসাবে এক এক টাকা দিয়ে থাকে। সেগুলি জমা হয়। এবং দিতে হয় পুরোহিত, পূজক, কারিগর, মালাকার, ছেত্তাদার, পরিচারক, পরামানিক, বাদ্যকর, ঘট-বহনের ব্রাহ্মণ বাহক, প্রতিমা-বিসর্জনের জন্য হরিজন বাহক, প্রতিমার চাল তৈয়ারির জন্য বাঁশের শলা তৈয়ারিকারী ডোম, প্রতিমা-বহনের জন্য বাঁশ-সরবরাহকারী বাগদী, বিসর্জনের শোভাযাত্রার শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং পাহারা দিবার জন্য লাঠিয়াল, প্রতিমার চুল তৈয়ারিকারক কৈবর্ত, আসন-অঙ্গুরীসরবরাহকারী স্বর্ণকার, পূজামণ্ডপে নৈবেদ্যের থালা রাখবার তেকাঠা ও নারিকেল ছাড়াবার জন্য ছুতার, হাড়িকাঠ পোঁতার জন্য ও কলাগাছ পোঁতার জন্য এবং বলির পাঁঠা যথাসময়ে হাজির করার জন্য চৌকিদার প্রভৃতি অনেককে, বাবের আর অন্ত নাই। এর উপর পার্বণী আছে বহুজনের। আশপাশের তীর্থস্থলের পাণ্ডারা আসে দেবতার নির্মাল্য নিয়ে, মাথায় নির্মাল্য ঠেকিয়ে আশীর্বাদ ক'রে পার্বণী নিয়ে যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আসেন তাঁদের বাড়ির দেবতার প্রসাদী উপবীত নিয়ে। বৈদ্য আসে, তার সঙ্গে এবারে ডাক্তারও যুক্ত হয়েছে। থানার কনস্টেবল আসে, পোস্টাপিসের পিওন আসে, রেজেস্ট্রি আপিসের কেরানী আসে, পরস্পরের বাড়ির চাকর চাপরাসীরা আসে, আবার তার সঙ্গে এল ইস্কুলের চাকর। বৃত্তিও আছে অনেক। গোচিকিৎসক, সাপুড়ে, নাই, ধোবা, জেলে, কামার থেকে আরম্ভ ক'রে মেথর পর্যন্ত। এর পর আছে ভিক্ষা। ভিক্ষুক আসে—বাউল, বৈষ্ণব, দরবেশ, ফকির ছাড়াও দলে দলে আসে সাঁওতালেরা। বড় বড় করতাল, সাঁওতালী সারেঙ্গী, কাঠের খটখটি, বাঁশী, মাদল

ময়ূরপালকের গুচ্ছ নিয়ে সামনে পিছনে দুদিকে কোঁচা ঝুলিয়ে এসে চণ্ডীমণ্ডপে নাচতে আরম্ভ করে, গান গায়, মধ্যে মধ্যে উর্‌র উর্‌র শব্দে সমস্ত কিছুকে চকিত ক'রে তোলে। বাব এতগুলি হ'লেও মোট খরচ খুব বেশি নয়; দুর্গাপূজায় রাধাকান্তের অংশ চার আনা, তাতে তাঁকে দিতে হয় বাইশ টাকা কয়েক আনা। সিকি শ্যামাকান্তের, বাকি অর্ধেকে স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতিগোষ্ঠী অনেকে আছেন।

অন্যান্য বৎসরে কাজটি যথানিয়মে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুসম্পন্ন হয়ে যায়। এ বৎসর কিন্তু অনেক সময় লাগল এবং অনেক বিতণ্ডার সৃষ্টি হ'ল। এ বিতণ্ডা সৃষ্টি করেছেন অমরনাথ। গোপীচন্দ্রের স্কুলপ্রতিষ্ঠার আয়োজনের প্রারম্ভ থেকেই অমরনাথ কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে এখানেই রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত অমরনাথের মধ্যে সত্যকার অগ্নি আছে। যুগের প্রগতিশালীদের তিনি অন্যতম ব্যক্তি। দেশের কল্যাণ-কামনায় আত্মনিয়োগের সহজ প্রবৃত্তি থেকেই তিনি এখানে অনেকগুলি সংস্কারের কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন ইতি-মধ্যেই। গোপীচন্দ্রের বড় ছেলে কীর্তিচন্দ্রকে পর্যন্ত অনেকটা প্রভাবান্বিত করেছেন তিনি। কীর্তিচন্দ্রের আবেগময় দিকটি যেন ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। অমরনাথ চান এখানকার সকল গ্রাম্য বিবাদ মিটিয়ে একটি সংঘবদ্ধ অভিজাত-সম্প্রদায়ের চেষ্টায় এখানে শিক্ষা-সংস্কৃতির ভুলচুক-ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সংশোধন ক'রে নতুন যুগ আনতে। কিশোরও এই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, লোকে তাকে বাধা দিয়েছে, উপহাস করেছে, অবশেষে তাকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছে। তার কারণ, কাল ছিল তার বিরোধী, একালে ব্যক্তিত্বের সম্মান ছিল সবচেয়ে বড়। কলেজের পড়ুয়া নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে কিশোরের কথায় এবং অধ্যাপক, গোপীচন্দ্রের আত্মীয়, স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দ্বারা অভিনন্দিত অমরনাথের কথায় গুরুত্বে অনেক প্রভেদ। অবশ্য উভয়ের কর্মপন্থার মধ্যেও কিছু পার্থক্য আছে। তরুণ কিশোর অন্যায়ের প্রতিবাদে আঘাত করতে চেয়েছিল, সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্তা ষোড়শীকে সে বিদ্রোহ ক'রে আশ্রয় দিয়েছিল। অমরনাথের কর্মপন্থায় আছে অন্যায়ের প্রতিবাদে একটি আপোসের ব্যবস্থা। সম্প্রতি বাউড়ীদের মেয়ে পরীকে নিয়ে যে কাণ্ডগুলি ঘ'টে গেল, তারই মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

পরীকে নিয়ে মুসলমান ও বাউড়ীদের মধ্যে বেশ একটি বিবাদ ঘনিয়ে উঠেছিল। দুষ্ট পড়াগুও তার সঙ্গে জড়িত ছিল। পরীকে মুসলমানের দুজন দারবান সেখ এবং পাতু হাজাম ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। পরীর মা এবং ভাই সাতন রাধাকান্তের কাছে এসেছিল প্রতিকারের জন্য। রাধাকান্ত তাদের প্রত্যাখান ক'রে বলেছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে নিজেকে বিব্রত করতে পারবেন

না। উপদেশ দিয়েছিলেন, মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় এবারত হাজী সাহেবের কাছে যাওয়ার জন্য অথবা থানার শরণাপন্ন হতে। কিন্তু ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে অন্য রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অযাচিতভাবে সাতনের পৃষ্ঠদেশে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রে এসে দাঁড়ালেন বংশলোচন। ব্যাপারটায় তিনি যেমন খুশি হয়েছিলেন, তেমনই ক্রুদ্ধও হয়েছিলেন। খুশি হয়েছিলেন—এই অকৃতজ্ঞ বাউড়ীরা অকৃতজ্ঞতার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছে এইজন্য। এ গ্রামে বণিকদের প্রতাপের কাহিনী লোকে অনেকদিন ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সরকার-বংশের প্রতাপ-প্রতিষ্ঠার কথা এখনও লোকে ভুলেও যায় নাই এবং সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তও হয় নাই। বাউড়ীদের অনেকেই এখনও সরকার-বংশের প্রজা। তৎসত্ত্বেও এই নিমকহারামেরা সরকার-বংশীয়দের দৌহিত্র-বংশীয় স্বর্ণবাবু, শ্যামাকান্তবাবু এবং রাধাকান্তবাবুদেরই অনুগত বেশি। বিপদে আপদে তাদের কাছেই ছুটে যায়, তাদের শাসন বেশি মানে, এবং সরকারবাবুদের সুযোগ পেলে অবহেলা দেখাতেও ছাড়ে না। তাই যে স্বর্ণবাবুকে সাতন পদ্মীকে উপঢৌকন দিয়েছিল, সেই স্বর্ণবাবুই যখন পদ্মীর এই অপহরণ-ব্যাপারে তাদের সাহায্য করলেন না, রাধাকান্তও যখন তাদের ফিরিয়ে দিলেন, তখন বংশলোচন খুশিই হলেন। যে সত্যকারের আশ্রয়দাতা পরিত্রাতা এ সত্য নিয়তি-পরিচালিত সূক্ষ্ম ক্ষুরধার পথে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—অন্ধকার গহ্বরে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে আলোক-রশ্মিপাতের মত। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হলেন এই অত্যাচারের জন্য। এ কি অত্যাচার? এ তো শুধু দুর্বলের উপর অত্যাচার নয়, এ যে ধর্মের উপর অত্যাচার! তিনি সাতন এবং সাতনের মাকে ডেকে আনলেন নিজের কাছারিতে—সকলের চেয়ে পুরানো কাছারি, এখনও সরকার-বংশের দেওয়ানখানা নামে খ্যাত। বললেন, কি বাবা, আক্কেল হয়েছে? কি বলে—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় চোখ খুলেছে? গুরু চিনেছ?

সাতন বুঝতে পারে নি কথাটা, বংশলোচনের এই ধরনের কথা তার পক্ষে বুঝে ওঠার কথাও নয়, সে বোকার মতই প্রশ্ন করলে, আজ্ঞেন?

আজ্ঞেন নয় রে বেটা, আজ্ঞেন নয়, বল্, আজ্ঞে। ভদ্র ভাষা বলতে গিয়ে দস্যুনেতা মচ্ছব লাগিয়ে দিয়েছে! বলি, স্বর্ণবাবুর পরিচয় তো পেলি, না কি? বোনকে যে বাবুর পদসেবা করতে পাঠিয়েছিলি, টুঁ শব্দটি করিস নি। এখন? এখন বোনকে ধ'রে নিয়ে গেল সেখেরা, এখন স্বর্ণবাবু কি করলে?

সাতনের মা হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

বংশলোচন ধমক দিলেন, থাম্ মাগী। যেমন গাল দিতে ওস্তাদ, তেমনই কাঁদতে ওস্তাদ। এদিকে আমাদের পাড়ার নষ্টদুষ্ট ছেলেরা ও-পাড়ায় পথে হাঁটলে ত চেঁচামেচি কত! গাঁয়ে গাঁয়ে খিটকেল ক'রে বেড়াবে।

সাতনের মা তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে। হেই বাবা, হেই হুজুর, আপনকার পায়ে ধরি, আপনকার মাটিতে-ফেলা থুতু চেটে খাই, আমার মেয়ে ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দ্যান। পদ্মী আপনকাদের ঘরে বাসন মাজবে।

থাম্, থাম্। নেমখারাম কোথাকার! সরকার-বাবুরা থাকতে তোর মেয়ে যাবে না। ব্যবস্থা করছি আমি।

তিনি ব্যবস্থা করলেন, বাউড়ীরা দল বেঁধে যাবে মুসলমান-পাড়ায়। তাদের নেতৃত্ব করবে সরকার-বংশের কয়েকজন সক্ষম সমর্থ জোয়ান ছেলে। সরকার-বংশের আর্থিক দুর্বলতার জন্য এখন পাইক-বল নাই, কিন্তু ছেলেরা দুর্দান্ত সাহসী এবং শক্তিশালীও বটে। এ যুগের অভিজাতসুলভ মৃদুতা এখনও তাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। আগেকার কালে দাঙ্গায় সরকারেরা বীরের মত নিজেরা দাঙ্গা পরিচালনা করতেন, তার রেশ এখনও তার মধ্যে আছে। বংশলোচনের বড় ভাইপো এদের মধ্যে অগ্রণী। সে অমিতবিক্রমে একখানা টাঙি হাতে পরশুরামের মতই নিয়ত চলাফেরা করে। তার নাম অংশুমালী। সে নিজেই বলে তার নিজের রচনা করা নিজের নামমাহাত্ম্য—

"হাম অংশুমা—লী
চাঁদ বনমা—লী।
হাঁতমে ভোজালি
লড়ে হালি হালি
জয় কালী জয় কালী
দুষ্ট দমনে শিষ্ট পালনে
জয় কালী জয় কালী।"

এই অংশুমালীই তাদের নেতৃত্ব করবে ঠিক হ'ল।

হাজী এবারত এল গোপীচন্দ্রের কাছে। মুসলমানদের অধিকাংশই অবশ্য স্বর্ণবাবুর প্রজা; কিন্তু পদ্মীর ব্যাপারটায় স্বর্ণবাবুর নাম এমন প্রকাশ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল যে, পদ্মীর ব্যাপার নিয়ে স্বর্ণবাবুর কাছে তারা আসতে ভরসা পেলে না। তা ছাড়া গোপীচন্দ্রই সম্প্রতি প্রধানতম ব্যক্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছেন এবং নগদ রোজগারের ব্যাপারে গোপীচন্দ্রই এখন সকল মুসলমান গাড়োয়ান এবং দিনমজুরদের আশ্রয়স্থল, জমিদার হিসেবেও তিনি তাদের সকলের কাছেই বিভিন্ন মৌজার জমিজমার জন্য খাজনা পেয়ে থাকেন। গোপীচন্দ্র সহসা কোন উত্তর দিলেন না। কীর্তিচন্দ্র সুযোগ পেয়েছিলেন, বংশলোচনেরা জমিদার হিসাবে এখন হীনবল হ'লেও এবং স্বর্ণবাবু শ্যামাকান্তের সঙ্গে বিরোধে তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করলেও দম্ভ তাদের কম নয়; সমস্ত ব্যাপারেই তাঁদের পক্ষে থেকেও এমন ভাবখানা প্রকাশ করে, যেন তারা তাঁদের

স্নেহাস্পদ। এই সুযোগে তাদের একটা ধাক্কা দিলে ফল একটা হবেই। কিন্তু গোপীচন্দ্র তাতে বাধা দিলেন। তিনি এই অনাচারকে সমর্থন করতে কোনমতেই পারেন না। তিনি বললেন, মেয়েটিকে তোমরা বার ক'রে দাও। আর দোষী দুজনকে হাজির কর।

এবারও বললে, হুজুর, তাতে আমরা গররাজি না। কিন্তু এমন জবরদস্তি করলি তো তা লারব। আর একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, মেয়েটারে বার করি দিলেই বা কি হবে কন? ওরে কি আর নিবে ওদের জাতে?

সে বিচার করবে ওরা।

এবারও চিন্তিত হয়েই উঠে গেল। তাদের সমাজ এ নিয়ে কি বলবে সে সম্বন্ধে তার সন্দেহ আছে। বিশেষ ক'রে ইতিমধ্যেই মেয়েটাকে যদি কলমা পড়িয়ে থাকে, তবে তাকে ফিরে দিতে তারা সহজে রাজি হবে না। পাড়ায় এসে সে বিস্মিত হয়ে গেল। স্বর্ণবাবুর লোক এসে গোপনে তাদের ভরসা দিয়ে গিয়েছে। সরকার-বংশীয়েরা জবরদস্তি করতে এলে তারা যেন ভয় না পায়। এবং ইতিমধ্যেই মেয়েটাকে যেন অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। গণ্ডগোল হ'লে স্বর্ণবাবু জমিদার হিসেবে অবশ্যই তাদের সাধ্যমত সাহায্য করবেন। তাদের সমাজের লোকে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। বলছে, বিপদ না হ'লে মানুষেরে চেনা যায় না। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে হাজী সাহেব, বনেদী জমিদার, ওনারে রেখে গোপীবাবুরে মান্য করা আমাদের কসুর হয়েছে।

স্বর্ণবাবুর মতিগতি বিচিত্র। পরীকে এখান থেকে সরিয়ে ফেললে তিনি নিষ্কৃতি পান, এটা অবশ্য একটা কারণ। এটা তিনি মনে মনে অনুভব করছিলেন। সমাজে দুর্নাম হয়েছে। সদম্ভে সেটাকে উপেক্ষা করবার মত সাহস এবং গাম্ভীর্য তাঁর আছে। কিন্তু তবু একটু আধটু উত্তাপ ও দুটির বর্ম ভেদ ক'রে তাঁকে স্পর্শ করে বইকি। তা ছাড়া বাড়িতে অভয়া অশান্তির আর শেষ রাখছেন না। ওদিকে অমূল্য ভূপতি নৃত্য করছে তাঁরই বাড়িতে ব'সে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্বন্ধে কে কি বলছে সেগুলি সাড়ম্বরে প্রকাশ ক'রে, ষোড়শী সংক্রান্ত তাদের অপবাদের গুরুত্ব স্খালন ক'রে বলছে, সে তো সদগোপের মেয়ে গো। আর এ যে বাউড়ী আমাদের যে চাবুক মারতে গিয়েছিল মামা। মা গো, তোমার ভাই আমার মামা! এই সব কারণেই পরী স্থানান্তরিত হ'লে তিনি নিষ্কৃতি পান। কয়েকদিন পরেই লোকে ভুলে যাবে। অতঃপর তিনি এসব অন্তত এই পাপ আর করবেন না এই সংকল্প করেছেন। আরও একটা কারণ, যেটা তাঁর স্বভাব, যে স্বভাবের হেতু তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না সঠিক, সেটা হচ্ছে এখানকার যে কোন ব্যক্তির যে কোন কর্মে, সে সৎ হোক, অসৎ হোক, তাতে বাধা দিতে তিনি আনন্দ পান। সরকারেরা বাউড়ীদের নিয়ে অপহৃতা পরীকে উদ্ধার করতে যাবে

তিনি এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব'লে পাঠালেন, জবরদস্তি করলে, তোমরা জবরদস্তিতে ভয় পেয়ো না। নতুবা পরীকে সারয়ে দেবার অন্য পথের অভাব ছিল না। 'সাঙা' দিয়ে অর্থাৎ আর একটা বিবাহ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া চলত, মেয়েটাকে বাজারের পথে কোন স্থানীয় শহরে পাঠিয়ে দিতে পারতেন।

ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো হয়েই উঠছিল। হয়তো একটা অঘটনই ঘ'টে যেত। কিন্তু অমরচন্দ্র মাঝখানে পড়লেন, ব্যাপারটাও আশ্চর্য কৌশলে একটি আপোসে পরিণতি লাভ করলে। তিনি মুসলমান-পাড়ায় নিজে গেলেন, নবগ্রামে স্বর্ণবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে বংশলোচন পর্যন্ত সকলের কাছে গিয়ে একটি পঞ্চায়েৎ গঠন করলেন। স্থির হ'ল, পঞ্চায়েৎ বিচার করবে অপরাধীদের। পরীকেও পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। সে-ই প্রধান সাক্ষী। সে যদি বলে, সে স্বেচ্ছায় গিয়েছে, তবে কোরবান এবং পাতু হাজাম অবশ্যই মুক্তি পাবে। পরীও তাদের সঙ্গে যাবে। অন্যথায় অপরাধীদের সাজা পেতে হবে। সেক্ষেত্রে বাউড়ী-সমাজ যদি পরীকে এই ঘটনার পরও ঘরে সমাজে নিতে চায় তবে পরী ফিরে যাবে, যদি নিতে না চায় তবে মুসলমান-সমাজকেই তার ভার গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানেরাও এতে সানন্দে রাজি হ'ল। তারা জানত যে, বাউড়ীরা প্রতিশোধের উন্মত্ততায় পরীকে উদ্ধার করতে চাইলেও সমাজে তারা তাকে নেবে না। পরীকে উপস্থিত করা হ'ল, কোরবান এবং পাতুও হাজির হ'ল। পরী সত্য কথাই বললে। কয়েক স্থানেই তখন তাকে ঘুরিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, প্রত্যেক স্থানেই যারা তাকে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল, তারা সকলেই পাতু এবং কোরবানের চরিত্রের লোক, তারা তার উপর অত্যাচার করেছে; তার ফলে সে তখন অসুস্থ, ক্লান্ত, অবসন্ন। ভ্রষ্টচরিত্রা হ'লেও এ অত্যাচার তার মনে একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। সে কাঁদলে, বলতে গিয়ে বার বার তার কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল। এবারও হাজী বার বার আল্লাহ্‌তায়লার নাম স্মরণ করলে, রাগে সে ফুলে ফুলে উঠল কোরবান এবং পাতুর উপর।

ঠিক এই সময়টিতে একটি আকস্মিক ঘটনা ঘ'টে গেল। সদর-শহর থেকে এসে উপস্থিত হ'ল সেখানকার মিশনের পাদ্রী সাহেব। তিনি পরীকে নিয়ে গেলেন নিজেদের মিশনে। বাউড়ীরা এতে খুশি হ'ল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও খুশি হ'ল। মুসলমানেরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লেও প্রতিবাদ করতে সাহসও পেলে না, যুক্তিও পেলে না। পরী যে হিন্দু-সমাজে ফিরে গেল না—এইটাই তাদের সান্ত্বনা হয়ে রইল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে বিরোধ হ'ল না, পাতু এবং কোরবান আইনের কঠোর দণ্ড থেকে বেঁচে গেল, এর খাতিরেই তারা ওই সান্ত্বনা নিয়েই চুপ ক'রে রইল। অমরচন্দ্র আরও খানিকটা সান্ত্বনা তাদের দিলেন। পাতু এবং কোরবানের শাস্তি

ভারটা ছেড়ে দিলেন হাজী সাহেবের উপর। বাউড়ীরা দাবি করলে সাতনের প্রায়শ্চিত্তের খরচ। তার বোনকে মুসলমানে যখন ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, তখন তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার খরচ ওই কোরবান এবং পাতুকেই দিতে হবে। সাতন এবং সাতনের মা দাবি করলে চন্দ্র গড়াঞীর বিচার। সেও তো ওই একই অপরাধ করেছে, বরং তারই অপরাধের গুরুত্ব বেশি, সে-ই পথ দেখিয়েছে; সে যদি জোর ক'রে পরীকে আপনার ঘরে টেনে না নিত, তবে পাতু আর কোরবান পরীর গায়ে হাত দিতে কখনই সাহস করত না। পঞ্চায়েতের মধ্যে রাধাকান্তও ছিলেন, তিনি বললেন, কথাটা ঠিক, চন্দ্র গড়াঞীর বিচার হওয়া উচিত ছিল সকলের আগে।

মুসলমানেরা খুব খুশি হয়ে উঠল এ মন্তব্যে। তারা বললে, বাবু মশায় হক কথা কয়েছেন।

এবারৎ বললে, আল্লা আপনাকে অনেক কাল বাঁচায়ে রাখুন বাপজান, হ্যাঁ, আপুনি উকিল বাপের ব্যাটা বটে।

চন্দ্র গড়াঞীকে পঞ্চায়েৎ ডেকে পাঠালেন। কিছুক্ষণ পর লোক ফিরে এল, চন্দ্র গড়াঞী আসে নাই। সে বলেছে—ব'লেই লোকটি চুপ ক'রে গেল।

রাধাকান্তই বললেন, বল, সে কি বলেছে?

সে বলেছে, গোয়ালপাড়ার ষোড়শীকে রাধাকান্তবাবু বাড়িতে রেখেছিলেন, তার জন্যেই সে বর্ধমানের বাজারে গিয়ে বেশ্যা হয়েছে। রাধাকান্তবাবুর বিচার আগে হোক, তারপর আমার বিচার করবে পঞ্চায়েৎ। তখন ডাকলে যাব।

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে যেন পাথরের মূর্তির মত হয়ে গেলেন। সমস্ত পঞ্চায়েৎ বাক্যহীন হ'য়ে বসে রইল কিছুক্ষণের জন্য। রাধাকান্তের মনের মধ্যে দ্রুতগতিতে ভেসে গেল অনেক কথা। নিজের মন্দ অদৃষ্টের কথা, বাহ্যিক প্রতিষ্ঠার অন্তঃসারশূন্যতার কথা, তিনি অর্থহীন, তাঁর কোন বিদ্যা-গৌরব নাই; তাঁর স্ত্রীর কথা, তাঁর কথা উপেক্ষা ক'রে কাশীর বউই ষোড়শীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এ তারই প্রতিফল; স্বর্ণবাবুর কথা, স্বর্ণ সেদিন রাত্রে ষোড়শীকে চেয়েছিলেন, চন্দ্র গড়াঞীর এই মিথ্যা উদ্ধত উক্তির মূলে স্বর্ণবাবুই রয়েছেন ব'লে মনে হ'ল তাঁর। শুধু স্বর্ণবাবু কেন? বংশলোচনের কথা মনে পড়ল, কীর্তিচন্দ্রের কথা মনে পড়ল।

লোকটি বললে, গড়াঞী আসছিল, পথে মহাদেববাবু তাকে ডাকলেন। সেখানে গিয়ে সে আলাদা সুর ধরলে। মহাদেববাবু আছেন, অমূল্যবাবু আছেন, ভূপতিবাবু আছেন। সেও রয়েছে ওইখানে।

মুহূর্তে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল রাধাকান্তের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের জোরের

অধিকাংশটাই তাঁর শান্ত হয়ে এল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, পঞ্চায়েতের মধ্য থেকে আমি স'রে যাচ্ছি, আমাকে বাদ দিয়েই আপনারা চন্দ্র গড়াঞীর বিচার করুন।

সেই মুহূর্তেই এসে উপস্থিত হলেন গোপীচন্দ্র। সংবাদটা তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছেছিল ইতিমধ্যেই। গোপীচন্দ্রের সমস্ত মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে; কোন কারণে রক্তোচ্ছ্বাস তাঁর মুখের শুভ্র-বর্ণের অন্তরালে যেন থমথম করছে ব'লে মনে হ'ল। তিনি এসেই বোধ করি রাধাকান্তের কথাগুলি শুনেছিলেন, তিনি বললেন, বসুন আপনি, বসুন। আমার কিছু নিবেদন আছে পঞ্চায়েতের কাছে।

রাধকান্ত বসলেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, কোরবান শেখ এবং পাতু হাজামের শাস্তির ভার দেওয়া হয়েছে হাজীর উপর। আমি সমাজের একজন প্রবীণ লোক, আমার উপর পঞ্চায়েৎ চন্দ্র গড়াঞীর শাস্তির ভার দিন। শাস্তি বিধান না করতে পারলে আমি সাজা নোব। চন্দ্র গড়াঞীর তিন অপরাধ। এক অপরাধ এই মেয়েটি সংক্রান্ত, দ্বিতীয় অপরাধ পঞ্চায়েতের অপমান করেছে সে, তৃতীয় অপরাধ রাধাকান্তমামার মত সজ্জন ব্যক্তির অপমান করেছে সে।

রাধাকান্ত কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, চন্দ্র আমার অপমান করেছে, আমারই ভাইপো মহাদেবের পরামর্শে। এ অপমান আমার প্রাপ্য। কেন না, যে পিতা পুত্রকে শিক্ষা দিয়ে জ্ঞান দিয়ে পশুত্ব থেকে মুক্তি না দিতে পারে, সে পিতাকে পুত্রের পশুত্বের হাতে লাঞ্ছিত হতেই হয়। আমার কথা বাদ দিয়ে, অন্য অপরাধের শাস্তির ভার পঞ্চায়েৎ আপনার হাতেই দিচ্ছেন।

পঞ্চায়েৎ শেষ হ'ল। পঞ্চায়েৎ বসেছিল রাধাকান্তের বৈঠকখানাতেই। সকলেই রাধাকান্তের প্রশংসা ক'রে ফিরে গেল। গোপীচন্দ্র বললেন, মামা, আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। পুত্রের বয়সী বললে ভুল হবে না। সেই বয়সের দাবিতেই আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি, আপনার নাম অক্ষয় হবে এ গ্রামে।

রাধাকান্ত বললেন, আপনি পুণ্যাত্মা, কীর্তিমান। আপনার আশীর্বাদ অবশ্যই ফলবে। কিন্তু পাত্রের আয়তন অনুযায়ীই তো গ্রহণের সামর্থ্য আমার। আপনার দান অজস্র, সে দান গ্রহণের মত আধার আমি নই। শিক্ষাকে বাল্যে অবহেলা করেছি—। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে, আত্মসম্বরণ ক'রে হেসে বললেন, ও আশীর্বাদ আমাকে নয়, আমার ছেলে গৌরীকান্তকে করুন। তিনি ডাকলেন, গৌরীকান্ত!

গৌরীকান্ত বাপের মজলিসে এতগুলি লোককে দেখে বাপের কাছে আসে নাই। এ শিক্ষা রাধাকান্তই তাঁকে দিয়েছেন। যখন বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত থাকেন

তিনি, তখন কাছে এসে দাঁড়াতে নেই, যাঁদের সঙ্গে কথা হয় তাঁরা বিরক্ত হতে পারেন। সেইজন্য সে সামনের বাগানে একটি মধুপানমত্ত বিচিত্রবর্ণের ছোট পাখির পিছনে পিছনে ঘুরছিল। বাবার ডাক শুনে সে তাঁদের দিকে ফিরে চেয়ে বললে, কেমন সুন্দর পাখি!

গোপীচন্দ্র বললেন, আমি তোমাকে একটি ভাল ময়না কিনে দোব।

গৌরী বললে, মা বলেছেন, পাখিকে খাঁচায় বন্ধ ক'রে রাখতে নাই।

রাধাকান্ত বললেন, এ দিকে এস। প্রণাম কর।

গোপীচন্দ্র তাকে কোলে তুলে নিলেন, কিন্তু সে আড়ষ্ট হয়ে পা দুটি সরিয়ে রাখলে, বললে, পায়ে ধুলো আছে, আপনার জামা ময়লা হবে।

গোপীচন্দ্র তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, এসব কে শেখালে তোমাকে? এত সব ভদ্রতা?

মা ব'লে দিয়েছেন।

রাধাকান্ত বললেন, ওর জীবন এখন ধাতুর পিণ্ডই রয়েছে। ও হয়তো আপনার আশীর্বাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার মত আধার তৈরি করতে পারবে।

গোপীচন্দ্র গৌরীকান্তকে আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নিলেন।

অমরচন্দ্র বিদায় নিলেন সকলের শেষে। তিনি এখানকার সমাজের কল্যাণে অনেক সংস্কারের কথা বললেন। বললেন, আপনি উদ্যোগী হ'লে হবে। ছেলেদের অনেকের উৎসাহ আছে। পবিত্রদের দল খাটতে চাচ্ছে।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, ওরা আমরা সম্পূর্ণ পৃথক অমরচন্দ্র। বয়সের পার্থক্য খুব বেশি নয়, দশ-বারো বছর কি পনেরো বছর। কিন্তু এই পনেরো বছর একটা মস্ত যুগ। ওরা একালের অর্থাৎ আপনি যে কালের সেই কালের মানুষ, আমরা সেকালে মানুষ—আগের কালের। ওদের কাজ আমরা বুঝবও না, আমাদের ধ্যান-ধারণাও ওদের পছন্দ হবে না।

অমরচন্দ্র তবু নিরস্ত হলেন না। এখানে বালিকা-বিদ্যালয় আর একটি লাইব্রেরি স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। বললেন, আপনি এ উদ্যোগে যোগ না দিলে কাজ সফল হবে না। মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের মনকে উন্নত করতে পড়াশুনা ছাড়া উপায় নাই। আপনাদের সেকাল গিয়েছে বলছেন, কিন্তু একালও যে এখানে আসে নি। একালকে আসুন। ছেলেদের মধ্যে অনেকে এর মধ্যে মদ ধরেছে শুনেছি। আপনাদের কালে লোকে ধর্মের অঙ্গ ক'রে মদ্য পান করত। তাতে একটা সীমা থাকত। মত্ত অবস্থাতেও একটা ধ্যান-ধারণার দিকে মন আবদ্ধ থাকত। এরা যে মদ খায় শুধু শুধু। এর যে কোন সীমা নাই, এর পরিণতিই যে পাশবিক।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমরা মত্ত হই 'কারণে', ওরা মত্ত হয় 'অকারণে'।

অমরচন্দ্রও হাসলেন।

রাধাকান্ত প্রশ্ন করলেন, পাদ্রী সাহেব খবরটা পেলেন কি ক'রে?

আমি ব্যবস্থা করেছিলাম।—অমরচন্দ্র হাসলেন।

অমরচন্দ্র সুকৌশলী। দৃষ্টিও তাঁর দূরপ্রসারী, জ্ঞানও গভীর। নানা সংস্কারের প্রস্তাবের মধ্যে এবার তিনিই প্রস্তাব করেছেন পার্বণী ও বৃত্তির তালিকা সংশোধনের। তিনি বলেন, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, প্রত্যেক বৃত্তিভোগীর কোন না-কোন সামাজিক কর্তব্য ছিল। পুরুষানুক্রমে তারা সেই সব কাজ ক'রে আসছিল। কিন্তু এখন তারা অনেকে সেসব কাজ করে না। এই দেখুন না, মানপুরের নৃসিংহ পাঠক পূর্বে কবিরাজ ছিল, তার বাপ-ঠাকুরদা সকলেই কবিরাজি করতেন; নৃসিংহ কবিরাজের ছেলে কবিরাজি ছেড়ে কলকাতায় ভাতরান্না করতে গিয়েছিল, তার ছেলেরা বাপের পথই ধরেছে। তারাও এখন বামন ঠাকুর। আপনাদের বাড়িতেই ঠিকের রান্নার কাজ ক'রে যায়। তাকে আপনারা আজও বৃত্তি দিয়ে চলেছেন কবিরাজ মানে চিকিৎসক হিসেবে। অথচ নতুন যারা কবিরাজী চিকিৎসা শিখে চিকিৎসকের কাজ করছে আশপাশের পল্লী-গ্রামে, তাদের কোন সম্মান আপনারা করেন না। তারপর ধরুন, গোপীচন্দ্র মেসোমশায়ের বাবা গরিব ছিলেন, তাঁকে পূজোর সময় আপনাদের বাড়ি থেকে স্নেহ এবং সম্মান ক'রে বৃত্তি দেওয়া হ'ত। সে বৃত্তি, তিনি আজ ধনী হয়েছেন, গ্রহণ করেন না, আপনারাও দেন না। সে বৃত্তি কোন গরিব প্রতিবেশীকে দেওয়া উচিত আপনাদের। এমনই ভাবে সন্ধান করলে অনেক পাবেন। গরিব হিসেবে যে বৃত্তি পেত, সে আজ ধনী না হোক, মধ্যবিত্ত হয়েছে, তার বৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই। অন্য যারা হীন অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তাদের সে বৃত্তি দিন। যে যে-কাজ করত, তার ছেলেরা সে কাজ করে না অথচ বৃত্তি নিয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে তাদের কাজ যারা করছে তারা সে সম্মান পাচ্ছে না। এগুলি সংশোধন করুন আপনারা।

গ্রামের প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই এই বিজয়াদশমীর পরবর্তী একাদশীর দিন 'শুভ সাইত্তের' উপলক্ষ্যে কিছু-না-কিছু বৃত্তি দিয়ে থাকেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই তিনি এ প্রস্তাব জানিয়েছেন। কয়েকটি নতুন বৃত্তির প্রস্তাবও তুলেছেন। গ্রামে ইতিমধ্যেই একটি লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে, বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে, তিনি লাইব্রেরির জন্য একটি ক'রে বৃত্তির প্রস্তাব করেছেন এবং বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য বৃত্তির কথা বলেছেন।

কথাটা চ'লেই আসছিল। দু দিন দশ দিন অন্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির বাড়িতে

গিয়ে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বর্ণবাবু, শ্যামকান্তবাবু, বংশলোচনবাবু আরও অনেকের কাছেই গিয়েছেন এসেছেন। গোপীচন্দ্র অমরচন্দ্রের কথামতই চ'লে থাকেন, অমরচন্দ্রের সকল কর্মেই তিনি পৃষ্ঠপোষক, সকল কথার উদ্ভবই হয়ে থাকে তাঁর ওখানে। রাধাকান্তকে অমরচন্দ্র নিজের কর্মে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করতে চান, যে কথাটাই উদ্ভব হয় তিনি রাধাকান্তের কাছে এসে কথাটি উত্থাপন করেন, আলোচনা করেন। রাধাকান্ত ভাবজগতের দিক দিয়ে সেকালের রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন হ'লেও তাঁর চিন্তায় উদারতা আছে ; নূতনকে গ্রহণ করতে না পারলেও তার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দিতে চান না। নিয়মিত শাস্ত্রপাঠের ফলে মন শাস্ত্রানুসারী হ'লেও, জ্ঞানের গভীরতায় এটুকু তিনি বুঝতে পেরেছেন, এসবই কালের লীলা, যে কাল ছিল, সেও এসেছিল অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ঐ কালের লীলায়, তার অবসান হয়ে নূতন যে কাল আসছে সেও আসবে সেই অবশ্যম্ভাবী কালের লীলাবৈচিত্র্যে। বয়স তাঁর বেশি নয়, বত্রিশ পার হয়েছে, যে কারণে এই বয়সেও সেকালের, সেই কারণেই বোধ করি এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। নূতন গ্রহণ করতেও মধ্যে মধ্যে মনে আগ্রহ হয়, আকাঙ্ক্ষা জাগে, কিন্তু সে পথে বাধা হয় আধুনিক কালের ইংরেজী জ্ঞানের অভাব এবং আর্থিক অসচ্ছলতার হেতু মানসিক গোপন বেদনা সপ্রাত পরাজিতের পঙ্গুতা।

গ্রামে যে লাইব্রেরিটি স্থাপিত হয়েছে, তার জন্য তিনি বৈঠকখানার একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন এবং তাঁর বইগুলি সবই দিয়েছেন, তার মধ্যে ধর্মগ্রন্থই বেশি, পুরাণ-তন্ত্রের অনেক বই, এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি বই, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতকগুলি বই। আরও দু-চারজন কিছু কিছু বই দিয়েছেন, তার সংখ্যা সামান্য। বাকি সকলে অর্থ সাহায্য করেছেন। শ্যামাকান্তের স্বর্গীয় পিতার নামে নামকরণ হওয়াতে তিনি একশো টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্বর্ণবাবুও দিতে চেয়েছেন পঞ্চাশ টাকা। তবে বলেছেন, শ্যামাকান্তদাদা তাঁর টাকা দিলে তিনি টাকাটা দেবেন। বংশলোচনও পঁচিশ টাকা দিতে চেয়েছেন ওই শর্তে। রাধাকান্তের প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ টাকা তাঁর দেওয়া বইয়ের মূল্য হিসেবে জমা হয়েছে। লাইব্রেরি যদি উঠে যায়, তবে তিনি তাঁর বই ফেরত নেবেন বলেছেন। লাইব্রেরি-পরিচালনার কাজ তিনিই দেখেন শোনেন, হাতে কলমে কাজ করে স্বর্ণবাবুর মাইনর ইস্কুলের একজন শিক্ষক, তাকে সাহায্য করে গোপীচন্দ্রের ছোট ছেলে পবিত্রের দলের ছেলেরা। পবিত্রই হয়েছে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি।

বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে, সেও বসবে উপস্থিত রাধাকান্তের বৈঠকখানাতেই, ওই লাইব্রেরির ঘরেই। বিদ্যালয়ের নামকরণ হবে স্থির হয়েছে, সরকার-বংশীয়দের পূর্বপুরুষদের সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির নামে। মোট কথা, বুদ্ধিমান পণ্ডিত অমরচন্দ্র গ্রামের অভিজাত-বংশীয়দের সকলেরই পূর্বপুরুষদের নামে এক-একটি

প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে সকল বংশকেই কীর্তিপ্রতিষ্ঠার গৌরবের অংশ দিয়ে নবগ্রামের একটি নির্বিরোধ সহযোগিতাসমৃদ্ধ কীর্তিমণ্ডল স্থাপন করতে চান। স্বর্ণবাবুকেও তিনি তাঁর পিতৃনামাঙ্কিত মাইনর ইস্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখতে বলেছেন। বলেছেন, সবচেয়ে ভাল হয় যদি ইস্কুলটিকে গোপীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত ক'রে গোপীচন্দ্র হাই ইংলিশ ও শৈলেশ্বর এম.ই. স্কুল নামকরণ করেন। স্বর্ণবাবুকেই ইস্কুলের সেক্রেটারি করা হবে। কিন্তু স্বর্ণবাবু তাতে রাজি হন নাই। স্বর্ণবাবু রাজি কিছুতেই ছিলেন না—লাইব্রেরি, বালিকা-বিদ্যালয়, কিছুতেই না। কিন্তু রাধাকান্ত তাঁকে বলেছেন, স্বর্ণ, এ সুযোগ ছেড়ো না, ছাড়লে আমাদের বংশাবলীকেই এই নবগ্রামে কীর্তিহীন হয়ে বাস করতে হবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কীর্তির আভরণ নবগ্রামের ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি, বিধাতা লিখেছেন, কীর্তি এখানে হবেই, এর পুণ্য এবং সৌভাগ্যের ভাগ নিতে চাও, লাভবান হবে ; না নিতে চাও, বঞ্চিত হবে তোমরাই। বাধা দিয়ে কীর্তি স্থাপনের পথ আটকাতে পারবে না ; কীর্তিমান এখানে জন্মগ্রহণ করেছে।

স্বর্ণবাবু বুদ্ধিহীন নন, বুদ্ধি তাঁর তীক্ষ্ণ। তিনি বুঝতে পারেন না এমন নয়। অবশ্য বিধিলিপি তিনি বুঝতে পারেন না, তবে এটুকু বুঝতে পারেন যে, তাঁরা সকলে মিলে এসব প্রতিষ্ঠা না করলে গোপীচন্দ্র নিজেই এগুলি প্রতিষ্ঠা ক'রে নাম কিনবেন এবং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটি তাঁরই বংশাবলীর নাম বহন করবে। তাই লাইব্রেরি এবং বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি সম্মতি দিয়েছেন, যোগও দিয়েছেন। কিন্তু অন্য সব সংস্কারের প্রস্তাবে তাঁর ঘোরতর আপত্তি আছে। বৃত্তি সংস্কারের প্রস্তাবে এবং উদ্যোগে তাই এত বিতণ্ডার সৃষ্টি। বৃত্তি সংস্কারের আন্দোলনে আপত্তি বংশলোচনপ্রমুখ সরকার-বংশীয়দের ঘোরতর। তাঁরা এটা গ্রহণই করেন নাই। তাঁরা বলেন, অধর্ম হবে। পিতৃপুরুষ ক'রে গিয়েছিলেন, আমরা তার বিচার করবার কে? তারা কর্ম ছেড়েছে, সে অধর্ম তাদের। তা ছাড়া—। বলতে গিয়ে মুখ-চোখের চেহারা পাল্টে যায়, আধ্যাত্মিক ভঙ্গী থেকে ভঙ্গী হয়ে ওঠে বৈষয়িক, বলেন, তা ছাড়া দু আনা চার আনা বড় জোর একটা টাকা দিয়ে বলতে তো পারব, আমাদের বৃত্তি ভোগ করে।

শ্যামাকান্ত বৃত্তি বন্ধ করতে প্রস্তুত, কিন্তু সে বৃত্তি অন্য কাউকে দেওয়ার যুক্তিতে আপত্তি করেন। স্বকীয় ভঙ্গীতে বলেন, একে বলে—বাপ-পিতামহ রোজগার করতেন, তাঁরা বৃত্তি দিয়ে কীর্তি ক'রে গিয়েছিলেন, একে বলে—আমরা ব'সে খাই, রোজগার করতে দীতি লাগে, একে বলে—আমরা নতুন বৃত্তি করতে পাব কোথা? একে বলে—মা-লক্ষ্মীর কথা শুনেছ কখনও—মা-লক্ষ্মীর কথা? মা বলেন, হয় চাল ছাড়, নয়তো আমাকে ছাড়। মানুষ চাল ছাড়তে পারে না, তাই লক্ষ্মী ছেড়ে চ'লে যান।

রাধাকান্ত কিন্তু অমরচন্দ্রের এ প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন

পথের এমন সুচিন্তিত সংস্কার তাঁর কাছে অভিনব ব'লেই মনে হয়েছিল। অন্য কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক তিনি এটিকে গ্রহণ ক'রে মানপুরের নৃসিংহ কবিরাজের বংশধরের এবং স্থানীয় আর এক ব্রাহ্মণের বৃত্তি বন্ধ করেছেন। ব্রাহ্মণটির বৃত্তি তাঁর শ্বশুর-বংশীয়ের প্রাপ্য বৃত্তি। তাঁরা দুর্গাপূজা করতেন, প্রতিমার গলায় উপবীত প্রসাদ দিয়ে। চার টাকা বৃত্তি নিয়ে যেতেন। সিকি অংশে সে বৃত্তির এক টাকা রাধাকান্তের দেয়। ব্রাহ্মণ গত হয়েছেন। পুত্রসন্তান না থাকায় উত্তরাধিকারী দৌহিত্রের অভিভাবক হিসাবে ব্রাহ্মণের জামাই আসেন বৃত্ত আদায় করতে। রাধাকান্ত জানেন, জামাইটি দুর্গাপূজা বন্ধ করেছেন, অথচ বৃত্তি আদায় করেন দাবি হিসাবে। তিনি সেটি দিতে অস্বীকার করলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, অন্য শরিকে যখন দিচ্ছেন, তখন আপনি দেবেন না কেন?

রাধাকান্ত বললেন, আমি অনেক কাজ করি যা অন্য শরিকে করেন না। অন্য শরিকের প্রসঙ্গ বা দৃষ্টান্ত দেবেন না। কথা আপনার ও আমার মধ্যে, আপনি যে কীর্তি বা কর্মের জন্য বৃত্তি পেতেন, সে কীর্তি যখন বন্ধ করেছেন, তখন বৃত্তি আপনি পাবেন কেন, সেই কথা আপনিই বলুন শুনি।

ব্রাহ্মণ মানপুরের কবিরাজ নৃসিংহ পাঠকের পাচকে-পরিণত বংশধরের মত স্থূলবুদ্ধি নন, তিনি সদরে মামলা-মকদ্দমার তদবির করেন, সেই হেতু তাঁর বুদ্ধি জটিল এবং ওই সদর-শহরে সুবিধা-সুযোগমত পূজক-পুরোহিতের কাজও ক'রে থাকেন, সেই হেতু ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কারদৃপ্ত তাঁর প্রকৃতি। তিনি নৃসিংহ কবিরাজের বংশধরের মত এক কথায় নিজেকে অসহায় মনে ক'রে মাথা নীচু ক'রে চ'লে গেলেন না; তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, বসলেন, বললেন, দেবকীর্তি বন্ধ করা অবশ্যই আমার পাপ, কিন্তু তাই ব'লে বৃত্তি বন্ধ ক'রে পাপ করবেন আপনি কোন্ যুক্তিতে? আমি এ অন্যায় ছাড়া আরও অন্যায় করি, আদালতে আমি হরদম মিথ্যা কথা বলি, সেই যুক্তিতে আপনি আমাকে কথা বলবার সময় মিথ্যা কথা বলবেন? তা ছাড়া ওই দেবকীর্তিটি বন্ধ করলেও অন্য দেবকীর্তি আমার আছে, আপনার বৃত্তি অনায়াসে সেই কারণেও পেতে পারি।

শ্যামাকান্ত এবং রাধাকান্ত উভয়েই আজ এক আসরে ব'সে সাইতের খরচ দিচ্ছিলেন, অসহিষ্ণুপ্রকৃতি শ্যামাকান্ত অধীর হয়ে উঠলেন ব্রাহ্মণের যুক্তি শুনে, ঘন ঘন নখ খুঁটতে খুঁটতে তিনি ব'লে উঠলেন, একে বলে—একে বলে, এ বাম্‌না, বাম্‌না বলে কি রে বাবা! একে বলে, চুরি ক'রে চোখ রাঙাতে এসেছে! একে বলে, তুমি কি হে বাপু? প্রশ্ন ক'রে নিজেই তিনি তার উত্তর দিলেন, লোকটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, ইউ আর এ লায়ার, ইউ আর এ চীটার, এ নেভ, এ প্যাঁচোয়াল পাটোয়ার অব দি ফার্স্ট রেট। মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দুর্বৃত্ত, পয়লা নম্বর প্যাঁচোয়াল পাটোয়ার! তুমি—তোমাকে—

রাধাকান্ত বাধা দিলেন। বললেন, ছি দাদা, থাম। ব্রাহ্মণ হাজার হ'লেও আমাদের বাড়িতে এসেছেন।

ঠিক এই মুহূর্তে স্বর্ণবাবু নিজেদের আসর থেকে এখানে এসে দাঁড়ালেন; রাধাকান্ত স্বর্ণের মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে গেলেন; স্বর্ণবাবুর দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে এবং গোঁফ ও চৈতন পাকানোর রকম দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটা বিতণ্ডা সৃষ্টি করতেই তিনি এসেছেন। তিনি তাঁকেই প্রশ্ন করলেন, কি স্বর্ণ?

স্বর্ণবাবু বললেন, ব্রাহ্মণত্বের গণ্ডটাকে কলমের ডগায় কেমন ক'রে কেটে ফেলছ, তাই দেখতে এসেছি।

শ্যামাকান্ত বললেন, তার মানে?

রাধাকান্ত বললেন, কাল দশমীর দিনেও তোমার সঙ্গে মায়ের প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে স্তবপাঠ করেছি, আজ এই আসরেই পূজার দক্ষিণা থেকে—বলিদানের টাকা দিলাম, সুতরাং শব্দ নষ্টের আশঙ্কা তোমার অমূলক। ব্রাহ্ম আমরা হই নি। তবে সংস্কার সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি।

ব্রাহ্মণের অভিশাপকে ভয় কর না?

মুহূর্তে ব্রাহ্মণটি উঠে দাঁড়ালেন, অন্য কেউ কিছু বলবার পূর্বেই তিনি দুই হাতের আঙুলে উপবীত জড়িয়ে উঁচু ক'রে টেনে ধ'রে ব'লে উঠলেন, থাক্ থাক্, আমি চাই না। কিন্তু হে মা দুর্গা, হে বাবা শঙ্কর, তোমরাই ব্রাহ্মণের আশ্রয়, তোমরা এর বিচার কর, ব্রাহ্মণের বৃত্তি যারা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়ে বন্ধ করলে, তাদের তুমি—

শ্যামাকান্ত আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, থাম্, থাম্, থাম্ রে বাপু! ওরে বেটা বাম্‌না, থাম্। নে নে, তোর টাকা নে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা ফেলে দিলেন।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ চুপ ক'রেই গিয়েছিলেন, তিনি টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে এক নিশ্বাসেই ব'লে উঠলেন, মঙ্গল ক'রো মা, বাবুদের তুমি মঙ্গল ক'রো। তারপর রাধাকান্তের সামনে হাত পেতে বললেন, দিন, এইবার আপনি দিন।

না। আমি দেব না।

স্বর্ণবাবু ব'লে উঠলেন, কি করছ রাধাকান্তদা?

রাধাকান্ত দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি দেব না স্বর্ণভূষণ। তুমি আবার ওকে ইঙ্গিত করতে পার অভিশম্পাত করতে।

স্বর্ণবাবু এ কথা শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, অভিশম্পাত দিতে ইঙ্গিত আমি দিয়েছি বলছ তুমি?

এক কথা দুবার ব'লে লাভ নাই স্বর্ণ। তুমি অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান, তোমারও দুবার শোনবার প্রয়োজন আছে ব'লেও আমি মনে করি না।

স্বর্ণবাবু বললেন, কিন্তু আইনে ও পাবে। বারো আনার শরিক যখন আদায় দিয়েছে, তখন আদালতে অবশ্যই ওর বৃত্তি বাহাল থাকবে।

রাধাকান্ত হেসে ফেললেন, বললেন, তখন দেব।

ব্রাহ্মণ এবার ব'লে উঠলেন, ভাল, তাই হবে, আমি নালিশই করব। ব'লে উঠে হনহন ক'রে চ'লে গেলেন।

স্বর্ণবাবু মুহূর্তে নিজেকে বোধ করি হারিয়ে ফেললেন; তিনি উচ্চকণ্ঠে ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন, বলতে বলতে যাও ঠাকুর, পথে পথে রাধাকান্তবাবুর মহৎ কীর্তির কথাটা বলতে বলতে যাও। পার তো একখানা ঢাক সঙ্গে নাও, ঢাকের খরচটা আমি দোব। তিনি গিয়ে আপনার আসনে গিয়ে বসলেন।

রাধাকান্ত একটি কথাও বললেন না; সামনে এসে এক দল সাঁওতাল দাঁড়িয়ে ছিল; বাবুদের কথাবার্তায় ব্যস্ত দেখে তাদের নাচ আরম্ভ করতে পারে নাই, তাদের বললেন, নে, আরম্ভ কর্ তোদের নাচ।

কমঝম শব্দে তাদের করতাল বেজে উঠল, ধিতাং শব্দে মাদলে ঘা পড়ল, সাঁওতালী সারেঙ্গীতে ছাড় টানলে, বাঁশী বেজে উঠল চার-পাঁচটা, জন পঁচিশেক সাঁওতাল পাঁচটি সারিতে বিভক্ত হয়ে পাঁচজন ক'রে পর পর সারিতে দাঁড়াল। তারা নাচতে লাগল।

নাচ শেষ ক'রে তারা এসে ইনামের জন্য হাত পেতে দাঁড়াল, দে গো বাবু, পোয়সা দে!

রাধাকান্ত তাদের লোক হিসাব ক'রে প্রত্যেকের এক পয়সা হিসাবে পঁচিশ পয়সা তাদের দিলেন।

শ্যামাকান্ত বললেন, আমার পয়সাটাও একে বলে, তুই দে। আমি তোর কাছে আট আনা পাব। একে বলে, বামুনকে আমি এক টাকা দিয়েছি, তার দরুন আট আনা, একে বলে, তোকে দিতে হবে।

রাধাকান্ত বললেন, আমার টাকা আমি দিই নি, তোমায় টাকা তুমি দিয়েছ ভয়ে, সে টাকার অংশ আমি দেব কেন?

একে বলে, দিতেই হবে। না দিলে, একে বলে, আমার কাছে তোর পাওনা হ'লে কেটে নোব আমি।

রাধাকান্ত সে কথার উত্তর দিলেন না। বাক্স বন্ধ ক'রে চাকরকে বললেন, তুলে আন্ বাক্স। উঠলাম আমি।

বাড়ি আসতেই কাশীর বউ তাঁকে প্রণাম করলেন। রাধাকান্ত ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, প্রণাম? কেন? কাশীর বউয়ের আচরণ তাঁর কাছে যেন সহজবোধ্য নয় ব'লে মনে হয়। স্ত্রীর প্রেম এবং সততা সম্পর্কে কোন দ্বিধা তাঁর নাই, কিন্তু তাঁর কুলগত আচরণের সঙ্গে মেয়েটির শিক্ষাদীক্ষায় প্রভেদ আছে, এটুকু তিনি প্রায় অহরহই অনুভব করেন। শুধু তিনি কেন, এখানকার সকলেই সেটা অনুভব করে। শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে কথাবার্তার ভঙ্গী, ব্যঙ্গশ্লেষ প্রকাশের ভঙ্গী সবই আলাদা। ক্রমশ সবই স'য়ে এসেছে এবং মেয়েটির হীনতা-দীনতা-লেশহীন অন্তরের পরিচয়ের ফলে, সে শিক্ষা এবং দীক্ষা ক্রমশ তাঁর ভালই লাগছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের স্বল্প-বয়সী মেয়েদের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে, অধিকবয়সী প্রবীণা আত্মীয়ারাও তাঁর আচরণে মুগ্ধ। চুল-বাঁধা, ঘর-সাজানো থেকে আচার-ব্যবহার রীতিনীতির শিক্ষায় তাঁরা মেয়েদের কাশীর বউকেই অনুসরণ করতে বলেন। অনাত্মীয়ারা স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা অবশ্য ঠিক এ চক্ষে দেখে না; অন্তত মুখে তো নয়ই। এসব সত্ত্বেও কাশীর বউয়ের কথাবার্তার ধরন এবং ভঙ্গীকে বেশ ভাল ক'রে না বুঝে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন না। হঠাৎ প্রণামে তিনি তাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, প্রণাম? কেন?

কাশীর বউ হেসে বললেন, অন্যায়ের শাসনকে যে ভয় করে না, তিনি সর্বজনের প্রণম্য। তার উপর তুমি আমার মহাগুরু—সাক্ষাৎ কাশীশ্বর।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, আজ সাইতের দিনে, দশমীর বলির মাংসটা অন্নপূর্ণা যেন স্বহস্তে পাক করেন। তোমার হাতের মাংস রান্না খেয়ে এ দেশের মাংস রান্না মুখে ভাল লাগে না।

আজ সবই আমি রান্না করছি।

তুমি দেশবরেণ্য সন্তানের মা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ কর। স্বামীগৌরব—

বাধা দিয়ে কাশীর বউ বললেন, না, ও কথা তুমি উচ্চারণ ক'রো না। আমার চেয়ে সুখী কে?

রাধাকান্ত হাসতে গিয়েও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর চ'লে গেলেন বৈঠকখানায়। নিজের ডায়েরি নিয়ে লিখতে বসলেন।

"আমরা বহুদিন হইতে সত্য যুগে প্রতিষ্ঠিত এই নবগ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছিলাম। কালের লীলায় বহুকাল পূর্বেই বহু সাধকের তপস্যার আলোকে প্রদীপ্ত এই মহাপীঠাশ্রিত নবগ্রাম অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সমগ্র ভারতেরই আজ এই অবস্থা। এই অবস্থায় যেরূপে পল্লীগ্রামের লোকে সাধারণত অজ্ঞান অন্ধকারে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে, তাহাই করিতেছিলাম। কিন্তু কালের গতির বিচিত্র লীলায় ভারতের এবং বঙ্গদেশে নূতন আলোকোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের তপস্যার পুণ্যে অত্র

গ্রামেরও সৌভাগ্য-রবি উদিত হইয়েছে ; তাহারই অরুণ-সারথির মত উদয় হইয়াছেন মহাভাগ্যবান গোপীচন্দ্র। আজ কর্মবলে তিনি পূর্ণপ্রকাশিত। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজরাজেশ্বরী ভারতেশ্বরীর অত্র জেলার প্রতিনিধি মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর উদারচেতা প্রজাবৎসল আমেদ সাহেবকে পাইয়াছি। তাঁহার কৃপাকটাক্ষে এবং উদ্যোগে ও গোপীচন্দ্রের বদান্যতায় এখানে এণ্ট্রান্স ইস্কুল স্থাপিত হইয়াছে। স্কুল-বোর্ডিং এবং একটি দাতব্য-চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হইবে। গৃহাদির নির্মাণকার্য চলিতেছে। ইতিমধ্যেই স্কুলের শিক্ষিত মাষ্টার ও পণ্ডিত মণ্ডলীর আগমনে এবং শিক্ষিতাগ্রগণ্য শ্রীযুত অমরচন্দ্রের শুভাগমনে পল্লীর অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া আলোকোদয়ে এক অভিনব সুখের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক নূতন বিপদ সমুপস্থিত হইয়াছে। কারণ জীবন যখন অন্ধকারে থাকে, তখন আর তাহাদের ভালমন্দের বিচার থাকে না, একজনকে অনুসরণ করিয়া অন্যজন চলে অন্ধের মত। কিন্তু যখন ওই জীব আলোকপ্রাপ্ত হইয়া সৎ ও অসৎকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহারা দুই পথের কোন্ পথ গ্রহণ করিবে, সেই সমস্যায় পড়ে, যাহারা সৎকে গ্রহণ করে, তাহারা যদি অসত্তের দমন করিয়া স্বীয় অধিকারে সৎকার্যের পরিচালন করিতে না পারে, তখন তাহাদের এক মর্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। আজ এই শুভ সাইত্তের দিনে, তদ্রূপ এক মর্মযাতনা—"।

ঠাকুরদা!

কীর্তিচন্দ্র ? এস, এস। দেখ, আজ শোনবামাত্র তোমার কণ্ঠস্বর চিনেছি।

কীর্তিচন্দ্র হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললেন, চিনবেনই তো, আমাদের যে ভালবাসেন।

রাধাকান্ত বললেন, ভালবাসা বুঝতে পারে শিশুতে নির্ভুলভাবে। বড় হ'লে ও শক্তিটা লোপ পায় ; দুধে রুচি ক'মে যায়। তখন স্বার্থকে মানুষ অমৃত জ্ঞান করে। যার কাছে স্বার্থের ব্যাঘাত না ঘটে, সে-ই ভালবাসে ব'লে মনে হয়। সাইত্তের দিন আশীর্বাদ করি, অন্তর তোমার শিশুর মতই নির্মল হোক।

কীর্তিচন্দ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন। মনে হ'ল, রাধাকান্ত তাঁকে কুটবুদ্ধি ব'লে শ্লেষ করলেন। রাধাকান্ত নিজেও কথাটা ব'লে একটু বিমনা হলেন। কথাটা বলতে গিয়ে যেন অন্য রকম হয়ে গেল, তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই। মুহূর্তে নিজেকে সংযত ক'রে তিনি বললেন, ব'স ভাই।

কীর্তিচন্দ্র ব'সে বললেন, আজকের সাইত্তের কথাটা শুনলাম।

রাধাকান্ত একটু হাসলেন শুধু।

বাবা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। বলছেন, গ্রামের মধ্যে মানুষ ওই একটি।

তাঁর মত কীর্তিমান সৌভাগ্যবান ব্যক্তি থাকতে গ্রামে একটি মানুষ আমাকে বললে আমাকে রহস্য করা হয়। তবে আত্মপ্রশংসা পাপ, তাঁর পুণ্যের সীমা নাই। এই সান্ত্বনা।

চন্দ্র গড়াঞীর জরিমানা পঞ্চাশ টাকা আদায় হয়েছে। টাকাটা ও বেলায় পাঠিয়ে দোব।

টাকাটা তোমার বাবাকেই ব'লো কোন সৎকার্যে দান ক'রে দিতে। ওটা আর আমাকে স্পর্শ করিও না। জান তো, চন্দ্র গড়াঞী আমার এবং শ্যামাকান্তদার নাথরাজের বসত প্রজা। তাঁর সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বোঝাপড়া আমার হবেই। অবশ্য চন্দ্র তোমার অনুগত লোক আমি জানি। তবে আমার বিরোধ প্রকাশ্য, গুপ্ত নয়।

চন্দ্রকে আপনার পায়ে এনে ফেলে দিচ্ছি আমি।

তাতে তো আমার সান্ত্বনা হবে না ভাই। তোমাকে তো আমার শক্তিতে শক্তিমান ব'লে মনে করতে পারব না।

উচ্চহাস্য ক'রে কীর্তিচন্দ্র বললেন, আপনার তকমা থাকে তো দিন, বুকে ঝুলিয়ে লাঠি হাতে পাগড়ি বেঁধে আমি সদর-রাস্তা দিয়ে গিয়ে চন্দ্রর ঘাড় ধ'রে এনে হাজির ক'রে দিই।

হেসে রাধাকান্ত বললেন, তাতে তোমার নাম কীর্তিচন্দ্র বদলে বিনয়ভূষণ হবে, কিন্তু লোকে বলবে, রাধাকান্ত সর্বস্বান্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

একটু চুপ ক'রে থেকে কীর্তিচন্দ্র বললেন, যাক ও কথা। আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আপনার কাছে—আমার নয়, বাবার প্রস্তাব।

বল।

আমাদের এখানকার বিষয়-সম্পত্তির কাজকর্ম বেশ ভালভাবে চলছে না। আমি বা বাবা দুজনকেই কলকাতার কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। পবিত্র ছেলেমানুষ, সে এসব বুঝতেও পারে না, আর বাবার ইচ্ছা তাকে কয়লা-কুঠির কাজকর্ম শেখাবেন। তাই বাবার প্রস্তাব, আপনি যদি আমাদের এখানকার কাজকর্ম দেখাশোনা করার ভার নেন, তা হ'লে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।

মুহূর্তে রাধাকান্তের সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম ক'রে উঠল। গোপীচন্দ্র তাঁকে চাকর রাখতে চায়!

কীর্তিচন্দ্র বললেন, দু ঘণ্টা ক'রে, এবেলা এক ঘণ্টা, ওবেলা এক ঘণ্টা আমাদের

কাছারিতে বসবেন। বাবা যে ঘরে বসেন, সেই ঘরে বসবেন। মাসে একশো টাকা হিসেবে অ্যালাউন্স পাবেন।

রাধাকান্ত মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইলেন। মাসে একশো টাকা বাড়িতে ব'সে উপার্জন, এ অভাবনীয়। (যে সময়ের কথা, ১৯০৬।৭ সালে একশো টাকার মূল্যও অনেক।) দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লেন বইকি। একটু পর বললেন, বিকেলবেলা এর উত্তর ভেবে দেব ভাই।

তা হ'লে বিকেলবেলা ইস্কুলডাঙ্গায় যাবেন। আমরা ওখানেই থাকব।

কীর্তিচন্দ্র চ'লে গেল। রাধাকান্ত ব'সে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ তাঁর চোখ থেকে দু ফোঁটা জল পড়ল ডায়েরির পাতার উপর।

অপরাহ্নে তিনি ইস্কুল-ডাঙ্গায় গেলেন। ইস্কুলের নতুন বাড়ি শেষ হয়েছে। বোর্ডিঙের বাড়ির গাঁথনি চলছে। নতুন বাসুদেব দীঘি টলমল করছে। দূরে ভাঁটার ইঁট পুড়ছে। স্কুলের আর এক দিকে আর একটি পুকুর, সেটি বৎসর কয়েক আগে কাটানো। তার চারিদিকে বাগানটি বেশ জ'মে উঠেছে। নবগ্রামের নব প্রতিমার মুখমণ্ডল গঠন হচ্ছে। শত শত ছেলের কোমল কচি মুখের লাবণ্য তাতে ফুটে উঠবে; তাদের শুভ্র উজ্জ্বল আশাপ্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টি সমষ্টিভূত ক'রে, সে প্রতিমার চক্ষুপদ্ম প্রস্ফুটিত হবে; দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হবে, সেখানকার চিকিৎসিত শত শত রুগ্ন লোকের ভরসায় ঈষৎ করুণ হাস্য ফুটে উঠবে দুটি ওষ্ঠাধরে। অপরূপ সে প্রতিমা! ভাগ্যবান গোপীচন্দ্র।

গোপীচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন মৃদুস্বরে, কি স্থির করলেন?

রাধাকান্ত বললেন, আপনি সূর্য। চন্দ্র ব'লে ভ্রম করছেন কেন? আপনার আবির্ভাবে সকল তারাকে বিলুপ্ত হতে হবে। কাউকে নিজের সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নাই।

গোপীচন্দ্র ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, এমন কথা আপনার কাছে শুনব প্রত্যাশা করি নাই।

রাধাকান্ত বললেন, দাসত্বের বন্ধনের পীড়ন থেকে বংশটিকে মুক্ত রাখতে চাই। কিছু মনে করবেন না। আমি দাসত্ব করলে, আমার বংশধরের উপরেও তার প্রভাব পড়বে।

গোটা নবগ্রামে সেদিন রাধাকান্তের কথা। শুধু নবগ্রাম কেন, গোয়ালপাড়ার নবীনদের মজলিসে, মুসলমান পাড়ায় এবারৎ হাজীর দলিজায়, নবগ্রামের বাউড়ীদের

আসরে ওই কথা। রাধাকান্তবাবু পৈতৃক বৃত্তি দিতে পারেন নাই, অথচ আশ্চর্যের কথা, গোপীচন্দ্র একশো টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিলেন, তা নেন নি।

মেয়েদের আসরে, চণ্ডীমণ্ডপে স্বর্ণবাবুর স্ত্রী অভয়া জিজ্ঞাসা করলেন কাশীর বউকে, হ্যাঁ দিদি, বটঠাকুর নাকি গোপীবাবুর কাছে চাকরি চেয়েছিলেন, গোপীবাবু ফিরিয়ে দিয়েছেন?

স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতিভগ্নী রজনী দেবী বললেন, এমন হীনমতি কেন হ'ল রাধাকান্তের? তুমি তো শিক্ষিতা, শহরের মেয়ে, তুমি বুঝিয়ে বলতে পার না?

কাশীর বউ হেসে বললেন, বলব ঠাকুরঝি। বলব—আপনারা বলেছেন।

কাশীর বউয়ের জবাব শুনে সকলেই হতবাক হয়ে গেল। রজনী-ঠাকরুণ সেকালের লেখাপড়া-জানা মেয়ে, গোটা গ্রামের মধ্যে তাঁর শিক্ষিতা এবং মহীয়সী ব'লে একটা খ্যাতি আছে, রুচিশালীনতা এবং স্পষ্টবাদিতার সম্পর্কে নিজেরও তাঁর অহঙ্কার আছে, তিনি পর্যন্ত কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর তিনিই হেসে বললেন, শহরের মেয়ে তুমি, লোকে বলে, তোমার নাকি চমৎকার শিক্ষা-দীক্ষা, এ পাড়াগাঁয়ে এমন কেউ আর হয় নি; কিন্তু লাগান-ভাজান কি সুশিক্ষার লক্ষণ? কি বলে তোমাদের শহরের শিক্ষায়, সভ্যতায়?

কাশীর বউ অত্যন্ত সবিনয়ে উত্তর দিলেন, আমি তো আপনার নামে দোষ দিয়ে কোন কথা তাঁকে বলব, এ কথা বলি নি ঠাকুরঝি। আমি বললাম, বলব—ঠাকুরঝি এই এই কথা বলছিলেন। আমার পরামর্শের চেয়ে তার ওজন অনেক বেশি হবে। আর আমি তাঁকে কি পরামর্শ দেব? সে কি আমার ছোট মুখে বড় কথা হবে না? তা ছাড়া—। তিনি একটু হাসলেন; বললেন, তা ছাড়া যে বিষয়ের কথা বললেন, সেটা আপনারা এক রকম শুনেছেন, আমি অন্য রকম শুনেছি, তাঁর মুখেই শুনেছি। শুনেছি—চাকরির কথা তিনি বলেন নি, বলেছিলেন ওঁরাই। উনি তাতে না-ই বলেছেন। আমি তো ওঁকে অবিশ্বাস করতে পারি না।

রজনী-ঠাকরুণ ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, আমরা কিন্তু অন্য রকম শুনেছি।

অবশ্যই শুনেছেন, নইলে এ কথা কি আপনারা গ'ড়ে বলছেন?

রজনী-ঠাকরুণ আরও গম্ভীরভাবে বললেন, তা ছাড়া, চাকরি সংসারে কেউ কাউকে সেধে দেয় না, চাকরির জন্যেই লোকে সাধাসাধি করে।

সাধারণ নিয়ম তাই বটে। কিন্তু সংসারে সাধারণ যা নয়, তাও তো ঘটে। আপনার মত লোককে সে কথা কি বুঝিয়ে দিতে হবে দিদি? না, আপনি যা বুঝতে পারছেন না, তা আপনাকে বুঝিয়ে দেবার আমার সামর্থ্য আছে?

রজনী-ঠাকরুণ এর পর বললেন, তা ঠিক। আচ্ছা, কথাটা আমিই রাধাকান্তকে জিজ্ঞাসা করব। তোমায় কিছু বলতে হবে না।

সেই ভাল হবে দিদি। আপনার কথা আমার বলা ভালও দেখায় না।

অভয়া এগিয়ে এলেন এবার; বললেন, আর একটা কথা শুধাই হে, দাঁড়াও। তোমরা কি জাতজন্ম—ধর্ম-অধর্ম মান না? বিলেতফেরতকে বাড়িতে তুললেন যে বটঠাকুর?

আশ্চর্য হয়ে গেলেন কাশীর বউ। সে কি? আমি তো কিছু জানি না!

এই মাত্তর আমি বাড়ি থেকে এলাম, শুনে এলাম। আমাদের প্রজা রায়-চৌধুরীদের জ্ঞানদা রায়চৌধুরীকে কে এক মেমসাহেব বিলেত পাঠিয়েছিল। সে দেশে ফিরেছে। তার নিজের গাঁয়ে কেউ তাকে ঠাঁই দেয় নাই—সহোদর ভাই পর্যন্ত না। সেখান থেকে উপোস ক'রে, গরুর গাড়ি ক'রে নবগ্রামে এসেছে, এসে উঠেছিল আমাদের বাড়ি। হাজার হ'লেও জমিদার-বাড়ি তো! তা উনি কি ক'রে ঠাঁই দেবেন? বিলেতফেরত। বটঠাকুর পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। এই মাত্তর আমি শুনে আসছি।

তাই নাকি? তা হ'লে আমি যাই। হয়তো খাবারদাবার করতে হবে। ব'লে আর কোন দিকে দৃকপাত না ক'রে কাশীর বউ চ'লে গেলেন।

অভয়া প্রমুখ সকলেই ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে অভয়া বললেন, দম্ভে ঠাকারে চোখে যেন দেখতে পায় না!

রজনী-ঠাকরুণ প্রণাম ক'রে নারায়ণ-মন্দির থেকে ফিরছিলেন, তিনি বললেন, শহরের মেয়ে যে! ওদের ধারাই ওই।

বাড়ি ফিরে কাশীর বউ দেখলেন, রাধাকান্তও ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ি ঢুকছেন। তাঁর সঙ্গে কিশোর এবং আরও একটি কিশোরের সমবয়সী কেউ। সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে চিনতে পারলেন, তবে অত্যন্ত পরিচিত মনে হ'ল। কে?

দিদি! এগিয়ে এল ছেলেটি। প্রণাম করলে।

রবি? তুই?

রবি কাশীর বউয়ের সহোদর।

রাধাকান্ত বললেন, তিনজন অতিথি—রবি, কিশোর, বাইরে আর একজন আছেন, মাননীয় ব্যক্তি, আমাদের এখানকার সেকালের রাজবংশ রায়চৌধুরী-বাড়ির ছেলে। শুনে থাকবে বোধ হয়, আমার বাবার কাছে রায়চৌধুরীদের গণেশ রায়চৌধুরী মুহুরীর কাজ

করতেন, তাঁরই ছেলে, বিলেত থেকে ফিরেছেন, তাঁকে বাড়িতে এনেছি। আয়োজন কর।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কাশীর বউ। কিশোর বললে, দাঁড়ান প্রণাম করি। বিজয়ার পর।

তার থুতনিতে হাত দিয়ে স্নেহ প্রকাশ ক'রে কাশীর বউ বললেন, দাঁড়াও ভাই, প্রণাম নেবার আয়োজন করি। তোমাদের খাবারের যোগাড় করি।

রাধাকান্ত চ'লে যাচ্ছিলেন। কাশীর বউ বললেন, একটা কথা বলছিলাম। রাধাকান্ত দাঁড়ালেন, কাশীর বউ এগিয়ে এলেন। বললেন, কথাটা বলব, দোষ ধ'রো না যেন। রায়চৌধুরী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তায় কি অন্য কারও কাছে, ওঁর বাপ তোমার বাবার মুহুরী ছিলেন এ কথা যেন কোনক্রমে মুখে এনো না। ওঁরা পুরনো রাজবংশের ছেলে।

রাধাকান্ত ব'লে উঠলেন, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ তুমি। আমাকে তুমি রক্ষা করেছ।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্নি

১

অংশুমান স্বপ্ন দেখছে। দিবাস্বপ্ন। জেলে ব'সে ব'সে। দেশের জন্য জেলে এসেছে। একখানা বই পড়তে পেয়েছে—ইলেক্‌ট্রিসিটির ইতিহাস। সেইটে কেন্দ্র ক'রেই স্বপ্ন জাগছে নানা রঙের। দেশের, অন্তরার, রূপকথার। মন উড়ে চলেছে জেলের প্রাচীর ভেদ ক'রে দূরদূরান্তে, অতীতে ভবিষ্যতে আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পলোকে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব, ডাক শুনতে পেয়েছি, যাচ্ছি……।" সে চলেছে। অনাদি অনন্ত অতীত থেকে অনাদি অনন্ত ভবিষ্যের দিকে অন্তহীন প্রবাহে। তার চলার বেগ, তার আগ্রহ, তার গাত-ব্যাকুলতা যুগে যুগে উতলা করেছে মানুষকে। মানুষ বোঝে নি ঠিক। বিস্মিত হয়েছে, অনুসন্ধান করেছে। আজও করছে…।

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে ফিরে থাকে অহরহ। কেন? যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে বৈজ্ঞানিক জন্মেছে। সত্য-আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছে অবিরাম।

চীন দেশের নাবিকেরা সমুদ্র-লঙ্ঘন করছে চুম্বকের সাহায্যে। গ্রীসের হোমার, থেলিস, পাইথাগোরাস, ইউরিপিডিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল সকলেরই ধ্যানভঙ্গ হয়েছে মাঝে মাঝে চুম্বকের টানে। লুক্রেটিয়াস, সিসেরো অবাক হয়েছে চুম্বকের কাণ্ড দেখে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই উদ্দেশ্যে চলেছি…" এ কথার অর্থ কিন্তু বোঝে নি তখনও কেউ। বোঝে নি, কিন্তু তার গতি-বেগকে কাজে লাগাতেও ছাড়ে নি।

একজন চীন-সম্রাট বিধ্বস্ত করছেন তাঁর প্রতিপক্ষকে চুম্বকের সাহায্যে দিক নির্ণয় ক'রে।…চলেছে ক্রুজেডাররা ধর্ম-যুদ্ধ করতে। যুদ্ধের অবসরে আহরণ করছে চুম্বক-তত্ত্ব শত্রু-পক্ষ আরবদের কাছ থেকেই।…গ্রীসের ওরেক্‌ল্‌কে নিয়ন্ত্রিত করছে চুম্বক।…কে রাজা হবে ঠিক করছে শূন্যে অবস্থিত চুম্বকের আংটি টেবিলের উপর বিছানো বর্ণমালার উপর ঘুরে ঘুরে।

রেশমের কাপড় দিয়ে তৃণমণিকে (amber) ঘষলে তৃণমণি নানাবিধ হালকা জিনিসের টুকরো আকর্ষণ করে। কেন? সুদূর অতীতে প্রাচীন গ্রীসে সবিস্ময়ে মানুষ ভাবছে, নিশ্চয় ওদের মধ্যেও আত্মা আছে। সুপ্ত আত্মা ঘর্ষণে জেগে ওঠে। তৃণমণি আর চুম্বকে দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে পুজো করছে কেউ কেউ। বিস্মিত মানবের জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা সত্য সন্ধান ক'রে চলেছে তবু। ধার্মিক ধর্ম-তত্ত্ব ভুলে সবিস্ময়ে ভাবছেন। পাদ্রি নিমগ্ন হয়েছেন চুম্বকের গবেষণায়।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, ডাক শুনতে পেয়েছি আমি, যাচ্ছি…" তার গতির স্পন্দন আকুল ক'রে তুলেছে মানুষকে। নানা বিজ্ঞানীর মনে নানা অর্থ বহন করছে। অর্থ অর্থান্তরে পরিণত হচ্ছে। যুগ-যুগান্তরে।

রাণী এলিজাবেথের ডাক্তার তিনি। অর্থোপার্জনের দিকে তাঁর মন নেই। ডাক্তারির দিকেও না। রুটির জন্যে ওসব করতে হয়, তাই করা। তাঁর সমস্ত মন প'ড়ে আছে চুম্বকের দিকে। চুম্বকেরই নানা তথ্য খুঁজছেন, ভাবছেন, লিখছেন। চুম্বক আর বিদ্যুৎ…কি এরা? একই জিনিসের বিভিন্ন প্রকাশ নয়তো? হয়তো…হয়তো…। সারাজীবন কেটে গেল প্রমাণ সংগ্রহ করতে। হঠাৎ মারা গেলেন একদিন। প্লেগে।

সে চলেছে।

শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, মেঘ-মেদুর অম্বর, অন্ধকার রাত্রি, ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি সমস্ত তুচ্ছ ক'রে রাধা যখন অভিসারে চলেছিলেন, নিকুঞ্জ-গৃহে অপেক্ষমান পীতবসন বনমালী ছাড়া আর কিছুই যখন তাঁর চেতনা-গোচর ছিল না, নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম্—সেই বাঁশী ছাড়া আর কিছুই যখন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না, তখন নিখিল বিশ্বও কি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে নি? আকাশে বাতাসে চন্দ্রে তারায় শিহরণ কি লাগে নি? কবির মনে জাগে নি কি স্বপ্ন? সেদিনকার স্বপ্ন-প্রবাহই কি আকুল করে নি পরবর্তী যুগের চণ্ডীদাস-জয়দেবকে?

তার গতির ছন্দও স্বপ্ন জাগিয়েছিল।

বেতার-বার্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন কেউ কেউ সে যুগেও।

অক্ষ-সংলগ্ন বিরাট এক গন্ধক-গোলক বস্ত্রঘর্ষণে বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠেছে। সশব্দে খানিকটা আলো ছিটকে পড়ল। বিস্ময়ে চমকে উঠলেন আবিষ্কারক। যন্ত্র-যোগে প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণ।

"যাচ্ছি…যাচ্ছি…যাচ্ছি…"

অপরা-তড়িৎ কেবলই মিলতে চায় পরা-তড়িতের সঙ্গে।

রহস্য-লোকে আলোকপাত হতে লাগল ক্রমশ। টোয়াইন সুতো দিয়ে পরীক্ষা ক'রে চমকে গেলেন একজন। সুতো বেয়েও বিদ্যুতের তরঙ্গ চলে। সাত শো পঁয়ষট্টি ফিট দূরেও বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখতে পেলেন তিনি। কৌতূহল জাগল, মানুষের শরীরের ভিতর দিয়েও এর গতিবিধি আছে নাকি? ছোট ছেলেদের উঁচুতে ঝুলিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন, তাদের শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুত চলাচল করে কি না! ছোট ছেলেরা তাঁকে দেখলেই পালাত। মুরগী নিয়ে পড়লেন শেষটা। সারাজীবন ধ'রে হাতড়ে গেছেন। রহস্যের পর রহস্য, নিত্য নূতন রহস্য। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েও বলছেন, টুকে নাও, টুকে নাও।

অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু পেয়েছি, প্রকাশ ক'রে যেতে পারলাম না। টুকে নাও—শিগগির—। বলতে বলতেই অন্তিম নিশ্বাস পড়ল।

এল আবার নূতন মানুষ। বাজল নূতন সুর তার কানে। চোখে ফুটল নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী। দু রকম বিদ্যুৎ আছে—এক রকম কাচ থেকে হয়, আর এক রকম রঞ্জন থেকে।

চুম্বক বিদ্যুৎ—কি এরা? সুপ্ত আত্মা? দেবতার প্রকাশ? অশ্রুতি-গোচর সুর কিন্তু বাজতেই লাগল—"যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাবই।" শুনতে পেলে না কেউ। বিচলিত হ'ল তবু নানাভাবে।

কৃষ্ণের বাঁশী বাজে, তবু যেতে পারে না রাধা। জটিলা কুটিলা আয়ান ঘোষ। রাজপ্রাসাদে ব'সে কাঁদে জাহানারা। নূরমহলের চামেলীকুঞ্জে বর্ষা নেবেছে। সমস্ত অন্তর গ'লে পড়ছে যেন। "দুলেরা, দুলেরা, কোথা তুমি? আমরা জলাশয়, তোমরা মরাল। কেন দূরে স'রে আছ এখনও?" জাহানারা কাঁদে, কিন্তু যেতে পারে না। বাধা দুস্তর। জাহানারা পাতশাহ বেগম, দুলেরা সামান্য গায়ক মাত্র। সব বাধা অতিক্রম করা যায় না।

...সব জিনিস বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়—আবিষ্কার করলেন একজন।

দেখা যায়, কিন্তু রাখা যায় না। কাছে আসে কিন্তু থাকে না। বাসনা-লোলুপ মানুষের চিত্ত উন্মুখ হয়ে ওঠে। বাসনার বহ্নিতে ইন্ধন যোগায় বুদ্ধি। চিরকাল যুগিয়েছে।

ঘোড়া গরু কুকুর হরিণ পাখি বনচর জলচর খেচর সমস্ত কিছু উৎসুক করেছিল একদিন মানব-মনীষাকে। এদেরও দেখা যেত, কিন্তু রাখা যেত না। কাছে আসত, কিন্তু ধরা দিত না। মানুষ ফাঁদ পাততে শিখল। খাদ্যের লোভে, সঙ্গীর লোভে, অসংখ্য অদৃশ্য প্রবৃত্তির অমোঘ তাড়নায় দলে দলে ধরা পড়ল প্রলুব্ধ পশুর দল। আয়ত্তাতীত ছিল যারা, আয়ত্তাধীন হ'ল। বন্য মানব সভ্য হ'ল। বন্য পশুর দল ঢুকল এসে মানবনির্মিত পশুশালায়। গ'ড়ে উঠল কৃষি সভ্যতা।

"...যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি....."

সেও যেতে চায়। সুযোগ পেলেই চ'লে যায়। সুযোগ পায় না কিন্তু সব সময়ে। কাচ বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়। কাচের কারাগারে বন্দী করলে পালাতে পারে না সে। মানুষ পশুশালা তৈরি করেছিল, হারেম তৈরি করেছিল, লিডেন জারও করলে। কাচের কারাগারে বন্দী হ'ল সে। হঠাৎ অংশুমানের মনে হ'ল, অন্তরাও তো বন্দী হয়ে আছে বিরাট একটা সামাজিক লিডেন জারে।

প্রথম লিডেন জার আবিষ্কারক প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছিল সে। প্রথম বন্দিনী মানবীও হয়তো প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল তার প্রথম অপহারককে। বন্য মানবীর মনে কি প্রেম ছিল না? সে কি কুক্কুরীর মত বলিষ্ঠতমের কাছেই আত্মসমর্পণ করত জৈবিক প্রেরণায়? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বরং এই কথাই ভাবতে ইচ্ছে করে, আজও যেমন সে প্রেমে পড়ে তখনও পড়ত। বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ডকে অগ্রাহ্য ক'রে অকারণে তার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠত একটি বিশেষ মানুষের জন্য। সে সুন্দর ব'লে নয়, ধনী ব'লে নয়, বলিষ্ঠ ব'লে নয়—সে সে ব'লে। তার বিশেষ একটি রূপ বিশেষ ক'রে তার চোখেই পড়েছিল ব'লে।

অন্তরা কি দেখেছিল তার মধ্যে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান। মনে হ'ল, একটা সত্যের আভাস পেয়েছে সে। জেলে এই একটি মাত্র বই পেয়েছে সে পড়বার জন্যে। খবরের কাগজও আসে—ইংরেজ-সম্পাদিত দৈনিক একখানা। এই বইটাই কিন্তু পেয়ে বসেছে তাকে। এর মধ্যেই অভিনব কল্পনার খোরাক পেয়েছে সে। প্রেমের আকর্ষণই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পৃথিবীতে। অপরা-তড়িৎ পরা-তড়িতের দিকে ছুটে চলেছে কিসের আকর্ষণে? প্রেমের? কে জানে!

খবরের কাগজ দিয়ে গেল। ইলেকট্রিসিটির ইতিহাস মুড়ে রেখে খবরের কাগজখানা খুললে সে। মিনিট খানেক পরে হঠাৎ তার গালে ঠাস ক'রে চড় মারলে কে যেন একটা। খবরের কাগজটা তাড়াতাড়ি নাবিয়ে রেখে দিলে সে। না, খবরের কাগজ আর সে পড়বে না। মিথ্যেয় ভরতি।

"ও, খবরের কাগজ পড়বে না? শোন তবে। তুমি চোর, তোমার বাবা চোর, তোমার চোদ্দ পুরুষ চোর। এদের জুতোর পায়ের ধুলো মাথায় পড়াতে

তবে তোমরা উদ্ধার হয়েছে। তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার চোদ্দ পুরুষ পাজি। এদের সংস্পর্শে এসে তবে তোমরা ভদ্র হয়েছ। তুমি মূর্খ, তোমার বাবা মূর্খ, তোমার চোদ্দ পুরুষ মূর্খ। এদের কাছে লেখাপড়া শিখে তবে তোমরা মানুষ হয়েছ……"

তারস্বরে চীৎকার করছে কানের কাছে। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে। হাত পা মুখ সব বাঁধা। চীৎকার করছে নিজের লোকেরাই—নিজের বাবা, নিজের ভাই, নিজের বন্ধু। কেউ চীৎকার করছে চরিত্র-ভ্রষ্ট হয়েছে ব'লে, কেউ চাবুকের চোটে, কেউ বকশিশের লোভে। চীৎকার চলেছে দিনরাত। হিমালয় থেকে কুমারীকা পর্যন্ত কোথাও বাদ নেই। তুমুল চীৎকার…বিরাট চীৎকার… চাবুকের চোটে চীৎকার বরছে…বকশিশের লোভে……

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। উঃ, কি দারুণ দুঃস্বপ্ন! চোখ চেয়ে দেখলে একবার, চারিদিকে অন্ধকার। চোখ বুজে পাশ ফিরে শুল। ঘুম আসছে না। তার সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটি কথাই জাগছে সারা দিন ধ'রে। বিজ্ঞানের এত আবিষ্কার শুধু কি মানব-পশুর পাশবিক শক্তিকে বাড়াবার জন্যেই? প্রেম নয়, হিংসাই কি তার পরিণতি? অন্তরার মুখখানা মনের মধ্যে ফুটে উঠল আবার। লজ্জিত হ'ল একটু।

"আমার আবিষ্কারের আসল সত্যটা তো তুমি জান।" চমকে উঠল অংশুমান। একটি হাস্যদীপ্ত মুখ চেয়ে আছে তার দিকে। তীক্ষ্ণ নাসা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট। মাথার সামনের দিকে টাক। ভয় পেয়ে গেল সে।

"কে আপনি?"

"আমি গ্যাল্‌ভানি। তুমি কষ্ট পাচ্ছ, তাই তোমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছি। ভালবেসেছ তার জন্যে লজ্জা কি? ভালবাসাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আমি ভাল বেসেছিলাম ব'লেই অতবড় আবিষ্কারটা ক'রে ফেলতে পারলাম। স্ত্রীর জন্যে নিজের হাতে যদি ব্যাঙের ঝোল রাঁধতে না যেতাম তা হ'লে হয়তো কিছুই হ'ত না……"

আর একজন এসে দাঁড়ালেন।

"ঠিক বলেছ। বিয়ে না করলে আমিও হয়তো বৈজ্ঞানিক হতাম না। মাদামোয়াজেল জুলিকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম ব'লেই উপার্জনের

চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক হতে হ'ল। তা না হ'লে হয়তো ল্যাটিন কবিতা নিয়েই মেতে থাকতাম সারা জীবন……"

একটু মুচকি হেসে গ্যাল্‌ভানি চ'লে গেলেন। অংশুমান বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল দ্বিতীয় লোকটির মুখের দিকে। একমাথা কোঁকড়ানো বড় বড় চুল। বড় বড় নীল চোখে প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি। বলিষ্ঠ নাক, পুরু ঠোঁট। প্রকাণ্ড কলারওলা বুকখোলা জামা গায়ে। গলায় একটা মাফলার জড়ানো।

আপনি…

আমি অ্যাম্‌পিয়র। আমাদের জীবন-চরিত নিয়ে তন্ময় হয়ে আলোচনা করছ তুমি, তাই একটা সাড়া প'ড়ে গেছে আমাদের মধ্যে। আমরা অনেকেই এসেছি তোমার কাছে। ভয় পেও না। তারপর একটু হেসে বললেন, ভয় পাবার ছেলে অবশ্য তুমি নও। যা কাণ্ড করেছ! কাণ্ডটা যে কত ভয়ানক তা আমার অজানা নেই, ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের মধ্যে আমি মানুষ। কিন্তু হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, তুমি যা ভাবছিলে আজ, যেটাকে সত্যের আভাস ব'লে মনে হচ্ছিল তোমার, সেটা বেশ নতুন কথা, হয়তো সত্য কথাই।

'হয়তো' বলছেন কেন?

সত্যের নানা মূর্তি—কোন্‌টা ঠিক তা কি ক'রে বলব? এই দেখ না, ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনকে প্রথমে সত্যের বড় একটা প্রকাশ ব'লে মনে হয়েছিল আমার, কিন্তু তারা যখন আমার বাবাকে কেটে ফেললে তখন আমি মুষড়ে গেলাম। সত্যের চেহারা গেল বদলে। হোরেসের ওড টু লিসিনিয়াস্ তখন একমাত্র সত্য ব'লে মনে হতে লাগল, তার জোরেই বেঁচে উঠলাম আবার। আসল কথা কি জান, যেটাকে সত্য ব'লে মনে হচ্ছে, সেইটেকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাক যতক্ষণ না সেটা মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়।

চোখ দুটো হাসিতে জলজল করতে লাগল। অকস্মাৎ অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন তিনি। অংশুমান প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু ভয় কেটে গেল তার। মনে পড়ল, ঠাকুমা একদিন দেখা দিয়েছিলেন তাকে স্কুলে টিফিনের সময়। পরলোক আছে। মানুষ মরে না, কেউ মরে না।

সোৎসাহে বিছানায় উঠে বসল সে। চতুর্দিকে অন্ধকার। অন্ধকারের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে রইল। দেখতে পেল, অন্ধকারের বুক চিরে বিরাট

একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রসারিত হয়ে রয়েছে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। সেই প্রদীপ্ত ক্ষুরধার আলোক-রেখা ধ'রে চলেছে অসংখ্য নরনারীর জ্যোতির্ময় মিছিল।

২

বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ নির্মেঘ। অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলছে। সহস্রপাদ সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জ্বলছে যেন অনন্তকালের অগ্নিদীপ্ত ইতিহাস। মাঠের মাঝখানে বটগাছটাকে ঘিরে খদ্যোতকুল শুরু করেছে অগ্ন্যুৎসব। গাঢ় তমিস্রা ভেদ ক'রে পেচকের কর্কশ রব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তা সঙ্গীতে রূপান্তরিত হ'ল পেচকের কর্ণে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর রাত্রি গম্ভীর। সাবধানসঞ্চরণে চলেছে শ্বাপদ, তস্কর, যোগী, ভোগী, দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে। আকাশের অগ্নি মর্ত্যের মৃত্তিকায় নেমে লীলায়িত হয়েছে নব নব রূপে নব নব প্রেরণায়। অন্ধকার পুরীর রহস্যলোকে রূপায়িত হচ্ছে চিরন্তন স্বপ্ন।

রোজ যেমন হয়।

৩

প্রতিদিনের মত তার পরদিনেও যথারীতি জেরা শুরু হয়ে গেল। সি. আই. ডি. দারোগাটি বিনয়ের অবতার। একমুখ হেসে পকেট থেকে পানের ডিবে বার ক'রে একসঙ্গে গোটা চারেক পান মুখে পুরে ফেললেন। তারপর ডিবেটি অংশুমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, আসুন।

আমি নেব না। ধন্যবাদ।

আজও নেবেন না?

অংশুমান চুপ ক'রে রইল।

দারোগা সাহেব তর্জনীতে খানিকটা চুন লাগিয়ে নীচের দাঁত দিয়ে সেটা কুরে তুলে নিলেন। জরদা খেলেন একটু। তারপর উঠে জানলা দিয়ে পিক ফেললেন একবার।

আপনি গোড়া থেকেই একটা ভুল করছেন অংশুমানবাবু। আপনি ধ'রে নিয়েছেন যে, আমরা আপনার শত্রুপক্ষ। গভর্মেণ্ট আপনার শত্রু হতে পারে, আপনারা নিজেরাই শত্রুতা করেছেন তার সঙ্গে, কিন্তু আমরা আপনার শত্রু নই, অন্তত আমি নই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে আপনাদের সুবিধে হয়।—হাস্যদীপ্ত চক্ষু মেলে চেয়ে রইলেন।

অংশুমান নীরব।

আপনার সঙ্গে আর কে কে ছিল, এই খবরটুকু পেলেই আপনাকে ছেড়ে দেব আমরা। আপনি যে নির্দোষ সে খবর আমরা পেয়েছি। কিন্তু দোষীকেও তো ধরতে হবে। আপনি সে বিষয়ে একটু সাহায্য করুন আমাদের শুধু। সেইজন্যেই আপনাকে আটকে রাখা। নাম কটা ব'লে দিন, বাস্।

আমি তো বলেছি, আমি কিছুই জানি না।

দেখুন, ওসব কথা ব'লে ভোলাতে পারবেন না আমাদের। আপনি যে জানেন তা আমরা জানি।

অংশুমান চুপ ক'রে রইল।

আপনি শিক্ষিত লোক, আপনার অন্তত আইনকে সাহায্য করা উচিত। সমাজকে রক্ষা করবার জন্যেই তো আইন, আপনার অন্তত সে আইনের মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য। একজন লোককে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ন্যায়ত হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়া আপনারও কর্তব্য নয় কি? জষ্টিস ব'লে একটা জিনিস আছে তো!

হঠাৎ গ্রীক দার্শনিকের কথাগুলো মনে প'ড়ে গেল তার। লিসন্ দেন, আই প্রোক্লেম দ্যাট মাইট ইজ রাইট অ্যাণ্ড জাষ্টিস ইজ দি ইনটারেস্ট অফ দি স্ট্রংগার...। সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্ধদগ্ধ ডেপুটিটার মুখখানাও মনে পড়ল। হাত-পা মুখ বেঁধে টাঙিয়ে পোড়ানো হয়েছিল তাকে পায়ের দিক থেকে। তার সেই ঠিকরে-বেরিয়ে-আসা লাল বড় চোখ দুটো এখনও যেন চেয়ে আছে তার দিকে। তারও তো মা বউ ছেলেমেয়ে আছে। তারা কি করছে এখন? তাদের দুঃখে মনটা দ্রবীভূত হচ্ছিল। কিন্তু বহু অসহায় আর্ত নারীকণ্ঠের চীৎকার আবার বেজে উঠল কানে সহসা।...দলে দলে পাঠান সৈন্য ঘরে ঘরে ঢুকে নারী-ধর্ষণ করছে ওই ডেপুটিটার হুকুমে।

একমুখ হেসে দারোগাবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, বেশ, না হয় ধ'রেই নিলাম আপনি কিছু জানেন না। আপনি কাকে সন্দেহ করেন, তাও বলুন অন্তত।

অংশুমান প্রস্তরমূর্তিবৎ ব'সে রইল, কোন উত্তর দিল না।

৪

জেলের বাইরে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের উপর বিশাল একটা শিরিষ গাছ। তার উঁচু ডালে ব'সে একটা দাঁড়কাক একটানা ডেকে চলেছে, কা—কা—

কা—কা—কা—কা···। আর একটি ডালে পাশাপাশি ব'সে আছে একজোড় ঘুঘু। স্তিমিত-নয়ন নির্বিকার। একটি ঘুঘু হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে পিঠ চুলকোতে লাগল।···শিরিষগাছের পত্রপুঞ্জে ফুটেছে মরকত-মণির আভা। কাছেই ছোট্ট এক টুকরো ঢালু জমি অপরূপ হয়ে উঠেছে নবদূর্বাদলশ্যাম কান্তিতে। খঞ্জনদম্পতি মনের আনন্দে চ'রে বেড়াচ্ছে তার উপরে। তাদের লঘুচপল গতি, পুচ্ছের আন্দোলন নিঃশব্দ ছন্দে স্পন্দিত করছে পারিপার্শ্বিককে। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের স্বর্ণকান্তি সমুদ্ভাসিত। দ্বিপ্রহরের উগ্রজ্যোতিতে চকচক করছে বেঅনেটের ডগাটা। জেলের গেটে খাকি পোশাক প'রে নিঃশব্দে পদচারণা করছে পাঠান প্রহরী।

৫

অপমানে সমস্ত চিত্ত অবসন্ন, হতাশার লক্ষ কণ্টকে বর্তমান ভবিষ্যৎ সমাকীর্ণ। তবু সেই কণ্টকবনে ফুল ফুটে রয়েছে একটি। অম্লান কুসুম। অন্তরা।

অন্তরাকে ভালবেসেছিলাম কেন—ভাবছিল অংশুমান। ভালবাসার অর্থ কি? কুসুমের কানে কানে মধুকরের যে গুঞ্জন, কমলকোরকের সুপ্ত পাপড়িতে সূর্যালোকের যে জাগরণমন্ত্র, তাই কি ভালবাসা? লজ্জাবতীর মত স্পর্শকাতর, সূর্যমুখীর মত উন্মুখ, আলোকের মত স্বচ্ছ, অন্ধকারের মত নিবিড় কি এ?···সহসা তার মনে হ'ল, অন্তরাকে ভালবেসে কি অন্যায় করেছি, অবনত করেছি নিজেকে? যে ভালবাসাকে কোনদিন বিবাহের বন্ধনে বাঁধা যাবে না, যা অসামাজিক অযৌক্তিক, অহেতুক··· সহেতুক? হঠাৎ মনে হ'ল। অন্তরার সমস্ত মূর্তিটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মানসপটে। ওই তন্বী স্বর্ণলতা, ওকে ভালবাসার হেতু নেই কোনও? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান।··· নিশীথ রজনীর তারাভরা আকাশ···দিগন্ত-বিস্তৃত পল্লীপ্রান্তরে ইন্দ্রধনুশোভিত ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘপুঞ্জ···বিশাল সাগরের অগণিত উর্মি-শিখরে অনাবিল জ্যোৎস্নার লাস্য-লীলা···ছবির পর ছবি জাগতে লাগল মনে।

সহসা মনে হ'ল, সহসা যেন দেখতে পেল সে, দাস্তে ছুটে চলেছে বিয়াত্রিচের পিছনে পিছনে নরক পর্যন্ত। নরক···? হ্যাঁ, নরকই তো। ভালবাসা কি মানুষকে নরকগামী করে? ভাবতে লাগল সে। আমি যা ভোগ করছি

এও তো নরক-যন্ত্রণা। অন্তরার জন্যেই তো কারাবরণ করেছি। অন্তরার চক্ষে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করবার জন্যেই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এই পাশবিক ঘূর্ণাবর্তে। তার কাছে আস্ফালন করেছিলাম নিজের পৌরুষ-মর্যাদা সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাসিয়ে দিয়ে। প্রদীপ্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দেখেছিল। কোন মন্তব্য করে নি, কোন উৎসাহ দেয় নি, কিন্তু তার মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছিল তাই যথেষ্ট ছিল আমার পক্ষে। তাকে খুশি করবার জন্যে, তার হৃদয় হরণ করবার জন্যেই জীবনমরণ তুচ্ছ ক'রে মেতে উঠেছিলাম আমি। তার স্মিত হাসি, মৌন জয়ধ্বনি পুরস্কৃত করেছিল আমাকে। ধন্য হয়েছিলাম···কিন্তু তার পরিণাম কি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করা? এই অন্ধকার ঘরটায় একা কাটাতে হবে দিনের পর দিন, কতদিন কে জানে! পরক্ষণেই মনে হ'ল, ওই বিয়াত্রিচের প্রেমই দান্তেকে স্বর্গেও নিয়ে গিয়েছিল শেষে।···রুমঝুম রুমঝুম রুমঝুম···মধুর নূপুররবে অন্ধকার ছন্দিত হয়ে উঠল সহসা।

কে?

আমি বেহুলা। দেবসভায় নৃত্য করছি, মৃত স্বামীর গলিত দেহে প্রাণ-সঞ্চার করবার জন্য।

সব থেমে গেল আবার। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল অংশুমান। অনেকক্ষণ ব'সে রইল। যখন সচেতন হ'ল, তখন তার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। অন্তরা··· অন্তরা···অন্তরা—! পরিপূর্ণ চিত্ত-সাগরের প্রত্যেক উর্মিটিই অন্তরা, কিন্তু সাগরের অন্তস্তলে স্রোত বইছে। প্রশ্নের, সন্দেহের। অর্থ কি এ ভালবাসার? বহুর মধ্যে এককে, নির্বিশেষের মধ্যে বিশেষকে এমনভাবে আবিষ্কার করলাম কেন? অন্তরার মধ্যে যে এত মাধুর্য আছে, তা আমার চোখেই ধরা পড়ল কোন্ মন্ত্রে? অর্থ কি এ আবিষ্কারের···

আবিষ্কারের অর্থ বড় রহস্যময়।

ঘাড় ফিরিয়ে অংশুমান দেখলে, অন্ধকার আলোকিত হয়েছে খানিকটা। একটি মুখ ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। গোঁফদাড়ি নেই। অতিশয় শুচিস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। চোখোচোখি হতেই সুমিষ্ট হাসি হেসে বললেন, আমি অরস্টেড। তারপর চুপ ক'রে রইলেন।

নীরবতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। অরস্টেডের দৃষ্টি থেকে একটা নীরব সান্ত্বনা ক্ষরিত হচ্ছিল যেন। মনে হচ্ছিল, একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন

তিনি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নির্মম পেষণে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, এর জন্যে তিনিই যেন দায়ী, এমনই একটা ভাব ফুটে উঠছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। অংশুমানের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, আবিষ্কারের কাহিনী বড় রহস্যময়। তার দায়িত্ব বা কৃতিত্ব কারও প্রাপ্য নয়। শিশু যখন আবিষ্কার করে যে, মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ আছে, তখন তার কৃতিত্ব কতটুকু? আবিষ্কার করেই বা সে কি ক'রে, কে ব'লে দেয় তাকে?

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, যে আবিষ্কারের জন্যে আমার এত নাম, তাতে আমার কৃতিত্ব যে কতটুকু তা তো জানই। আমার চোখে পড়েছিল। আমি লেক্‌চার দিচ্ছিলাম একটা, কয়েলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল, কাছেই ছিল একটা ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌ল। হঠাৎ সেটা ন'ড়ে উঠল, হঠাৎ আমার চোখে প'ড়ে গেল। প্রথমটা পড়ে নি, কিন্তু যতবারই কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেল ততবারই নড়ল সেটা। কেউ যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। বিজ্ঞান-জগতে যেটা যুগান্তরকারী আবিষ্কার, সেটা একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। তার জন্যে আমি দায়ী হতে পারি না—না না, কিছুতেই না।

আর্তনাদ ক'রে উঠলেন যেন, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর্তনাদটা মনে মনে উপভোগ করলে অংশুমান। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে ঘনিয়ে এল বিষাদের ছায়া। তার আবিষ্কারটা তো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। সে যেচে গিয়ে আলাপ করেছিল। অন্তরার চোখে মুখে কি যেন একটা ছিল। কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি সে। যদিও তার সামনে একটি কথাও বলতে পারত না, কিন্তু দুর্নিবার আকর্ষণে যেতে হ'ত তাকে প্রত্যহ। তার চোখে নিজেকে বৃহৎ প্রতিপন্ন করবার দুর্নিবার প্রলোভনেই সে···

বাজে চিন্তা ক'রে অকারণ শক্তি ক্ষয় করছ।

এলেন আর একজন। একমাথা ঝাঁকড়া কটা চুল। চমৎকার চোখ দুটি। নাক তীক্ষ্ণ।

অকারণে শক্তি ক্ষয় করছ। তোমার প্রণয়িনীর জন্যে তুমি দেশের কাজে নাব নি। ওটা বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা। দেশই তোমার বরাবর লক্ষ্য, প্রণয়িনীটা উপলক্ষ্য মাত্র। প্রণয়িনীই যদি তোমার লক্ষ্য হ'ত, তা হ'লে তুমি পাঁচিল টপকাতে, ডেপুটি পোড়াতে যেতে না।

একটা চাপা হাসি উঁকি দিচ্ছিল চোখ দুটি থেকে, কিন্তু নিমেষে সেটাকে অবলুপ্ত ক'রে ফুটে উঠল অনুযোগমিশ্রিত ভৎর্সনা।

কক্ষনও যেতে না। মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য কি অর্থাৎ কোন্ রাস্তায় গেলে তার আত্মা সত্যিই পরিতৃপ্ত হয়, তা প্রথমটা সে বুঝতে পারে না। লেখক ডাক্তার হয়, কবি ব্যবসা করতে যায়, দেশপ্রেমিক নারীপ্রেমে কিংবা যশের নেশায় মশগুল হয়ে পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে স্বখাতে ফিরে আসতে হয় বাজে বন্যাগুলো স'রে গেলে। এই দেখ না, আমি সোল্‌জার হব ব'লে মেতেছিলাম···

একটু হেসে তারপর বললেন, না মেতে উপায়ও ছিল না। সোল্‌জার হওয়াটাই তখনকার দিনে ফ্যাশান ছিল যে। ফ্যাশান জিনিসটা হাম-জ্বরের মত, ওর কবল এড়ানো শক্ত। কিন্তু পলিটেক্‌নিকের পরীক্ষায় পাস না করলে সেকালে সোল্‌জার হওয়া যেত না। সেই পরীক্ষা দিতে হ'লে অঙ্ক শিখতে হ'ত। অঙ্ক নিয়ে মাতলাম। সেই যে মাতলাম, বাস্। ওরা দেখলে, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো বৃথা। পাঠালে অব্‌জার্‌ভেটরিতে। বিওর সঙ্গে ভাব হ'ল। গ্যাসের রিফ্র্যাকটিং প্রপার্টি নিয়ে পড়লাম। তারপর মেরিডিওনাল মেজার্‌মেণ্ট। পিরেনিজ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে···তুমি তো সব জানই।

একটু চুপ ক'রে আর একটু হেসে বললেন, না, জান না, নিদারুণ শীতে পিরেনিজ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যখন ভৌগোলিক সঙ্কেত করেছিলাম, তখন আমার কষ্ট হয় নি, আনন্দ হয়েছিল—আমার জীবনচরিতকার সে কথাটা লেখে নি। তারপর পাহাড় থেকে নাববার সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডরা আমাকে স্পাই ভেবে যখন তাড়া করেছিল, তখনও আমার ভয় হয় নি, অদ্ভুত একটা আনন্দ হচ্ছিল, এমন কি বেল্‌ভার ক্যাস্‌লে পালিয়ে এসে সেই ভণ্ড পাদ্রিটার পাল্লায় পড়লাম যখন, যিনি আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন, তখনও আমার রাগ হয় নি, মজা লাগছিল। আমার মনের মধ্যে অফুরন্ত নির্ভীক যে আনন্দের ভাণ্ডার ছিল, সে খবর আমার জীবন-চরিত থেকে পাও নি তুমি। ওইটে ছিল ব'লেই কাবু করতে পারে নি আমাকে। বিপদ তো কম হয় নি, সবই তো পড়েছ। পাদ্রির কাছ থেকে পালিয়ে পেয়ে গেলাম একখানা অ্যালজেরিয়ান জাহাজ, কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই পড়লাম আবার একদল স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুর হাতে। তারা আমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এল স্পেনে। প্রথমে

রাখলে একটা উইণ্ড-মিলে, তারপর একটা জাহাজের খোলে, প্রায় তোমারই মত অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দমি নি। ওদেরই একজনের সঙ্গে ভাব ক'রে ফেললাম। হ্যাঁ, ওইটি চাই, দরকার হ'লে শত্রুপক্ষের সঙ্গেও ভাব করা চাই। শত্রুপক্ষের মধ্যেও ভাব করবার মত লোক পাওয়া যায় বইকি। আমি যে লোকটার সঙ্গে ভাব করেছিলাম, সে অতি চমৎকার লোক। এত চমৎকার যে, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে আমায় ছাড়িয়ে নিলে, তারপর টিকিট ক'রে তুলে দিলে একটা জাহাজে। কিন্তু কপাল ছিল মন্দ, ঝড় উঠল। আমাদের জাহাজকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে একেবারে আফ্রিকায়। সেখানে আবার স্প্যানিয়ার্ড। কিন্তু এবার ব্যাটারা নিজেদের মধ্যেই এমন মারামারি শুরু ক'রে দিলে যে, আমি পালাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে ছ মাস পরে দেশে ফিরি। এত কাণ্ড ক'রেও কিন্তু সোল্‌জার হলাম না, কিছুই হলাম না, শেষ পর্যন্ত আমাকে ইলেক্‌ট্রিসিটি আর ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম নিয়ে পড়তে হ'ল। কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌ল ন'ড়ে উঠছে কেন, অরস্টেডের এই আবিষ্কার পেয়ে বসল আমাকে। যতক্ষণ না বার করলাম যে, কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে কয়েলটাই ম্যাগ্‌নেট হয়ে যায়, ততক্ষণ আমার শান্তি ছিল না। কিন্তু বার করবার পর কি আনন্দ! তাই বলছি, আনন্দটাই আসল জিনিস, ওটা না থাকলে কিছু হয় না। আমার কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছিল অরোরা বোরিয়ালিস আর ম্যাগ্‌নেটিক স্টর্মের সম্পর্ক আবিষ্কার ক'রে, মানে, হ'ল কি···

অংশুমান সবিস্ময়ে শুনছিল।

আপনি কি আরাগো?

প্রশ্ন শুনে থমকে গেলেন আরাগো। পরমুহূর্তেই চ'টে গেলেন কথায় বাধা পড়াতে। আমি কে তা নিয়ে কি দরকার, যা বলছি শোন না। আনন্দটিই আসল জিনিস, ওইটে না থাকলে তলিয়ে যাবে। তুমি ওই যে একটা থিয়োরি খাড়া ক'রে মন গুমরে ব'সে আছ যে, অন্তরার জন্যেই তুমি এত কাণ্ড করেছ, ওটা একদম বাজে কথা। যা তোমার আনন্দকে ম্লান করছে, জানবে তা বাজে জিনিস—বিষবৎ পরিত্যাগ করবে সেটা। তা ছাড়া সত্যিই ওটা বাজে কথা। অন্তরা হয়তো তোমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে—আমি যেমন সোল্‌জার হতে চেয়েছিলাম—কিন্তু দেশই তোমার—

তুমি বড্ড বেশি বকবক করছ। ঘুমুতে দাও না বেচারীকে একটু।—অ একজন এসে দাঁড়ালেন আরাগোর পাশে। প্রশস্ত ললাট, সামনের দিকে ট থাকাতে আরও প্রশস্ত দেখাচ্ছে। মাথার পিছনে ছোট ছোট কাঁচা-পা চুল। কাটা কাটা নাক মুখ চোখ। বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু সমস্ত মুখে বিনী ভদ্রতা যেন মাখানো।

ঘুমুবে? এর মধ্যেই? এই তো সবে দশটা বেজেছে। অংশুমানে দিকে চেয়ে আরাগো প্রশ্ন করলেন, এঁকে চেনো? তারপর নিজেই উত্ দিলেন, ইনি স্টার্জন। হ্যাঁ, সেই মুচির ছেলে। এঁরই বাপ কেবল মাছ ধ' আর পাখি শিকার ক'রে বেড়াতেন, তাও চুরি ক'রে। পোচিং! ইনি আর্মিতে ঢুকে কুড়ি বছর কামান দেগেছিলেন। কিন্তু কিচ্ছু হয় নি। হ একদিন বিরাট এক ঝড় উঠে। বজ্রের গর্জন শুনে আর বিদ্যুতের ঝলকা দেখে তাক লেগে গেল ভদ্রলোকের। কামান দাগার অবসরে লুকিয়ে লুকি পড়াশোনা শুরু করতে হ'ল। প্রথমে গ্রীক ল্যাটিন অঙ্ক, তারপর ইলেক্‌ট্রিসি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম। শেষ পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেট তৈরি করতে হ'ল।

না না, আমি—

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন স্টার্জন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন এস, চল, যাই। ও ঘুমুক এখন—

এই কুনো স্বভাবের জন্যেই তুমি মরেছ। তোমার কীর্তিটা লোকে জানতে পারলে না ভাল ক'রে। ওদিকে আমেরিকায় হেন্‌রির জয়জয়কার। আচ্ছা হেন্‌রি কোথা গেল বল তো? তারও যে আসবার কথা ছিল। আসবে বো হয় এখুনি, দাঁড়াও না একটু, বেশ জমানো যাক সবাই মিলে।

না, চল, যাই আমরা।

হেন্‌রির সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করছে বুঝি? আমি বলছি ইলেক্‌ট্রো ম্যাগ্‌নেটের কীর্তি তোমারই প্রাপ্য, হেন্‌রির নয়। হেন্‌রিও সে কথা স্বীকা করবে। তার সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার অধিকার আছে তোমার লজ্জা কি?

আরাগোর চোখের দৃষ্টিতে চাপা কৌতুক ফুটে উঠল।

কি যে বলছ, লজ্জা কিসের! তা ছাড়া আমার প্রাপ্য তো আমি পেয়েছি

কি পেয়েছ?

একটা রূপোর মেডেল। ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেট তৈরি ক'রে বিক্রিও করেছি নেকগুলো। লেক্‌চারার হয়েছিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছিলাম, আবার কি ই?

চোখ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। যাঁকে লাজুক ব'লে মনে হচ্ছিল, দেখা াল তিনি বেশ সপ্রতিভ।

অংশুমান আর থাকতে পারলে না।

আচ্ছা, একটা কথা কি আপনাদের কখনও মনে হয় নি, নেগেটিভ লেক্‌ট্রিসিটি পজিটিভের দিকে যায় কেন?

যায় কেন? যায় ব'লেই যায়, যাওয়াই নিয়ম। —ভ্রূযুগল উত্তোলন ক'রে ারাগো বললেন।

স্টার্জন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন।

কেন এমন নিয়ম হ'ল?

আরাগো 'হ্রাগ' করলেন। তারপর স্টার্জনের দিকে ফিরে বললেন, তুমি কই ধরেছ, এর ঘুমোনো দরকার এখন।

অংশুমানকে বললেন, ঘুমোও তুমি। আর যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, নই কথাটা মনে রেখো, দেশই তোমার আসল প্রেরণা, অন্তরা নয়। একটা াজে চিন্তা ক'রে মুষড়ে পড়বার দরকার নেই। চললাম। গুড নাইট।

চ'লে গেলেন দুজনেই।

অংশুমানের ঘুম এল না। চোখ বুজে শুয়ে রইল সে চুপ ক'রে। নীরবতা নিয়ে এল আবার চতুর্দিকে। তারপর ধীরে ধীরে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। স্পষ্ট থকে স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি···তোমারই দিকে চলেছি অক্লান্ত গতিতে···সত্য পথে··· মস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে···"

কে—কে তুমি?

চীৎকার ক'রে উঠে বসল অংশুমান। কোন উত্তর এল না। হঠাৎ সে দখতে পেল, অসংখ্য উজ্জ্বল খদ্যোতপুঞ্জ উড়ে চলেছে অজানা অন্ধকারের দিকে শ্রান্ত গতিতে তমিস্রাকে তুচ্ছ ক'রে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। লেছে অন্তহীন প্রবাহে জ্যোতির বুদ্বুদমালা। কে ওরা···কি ওরা···? চাখ বুজে শুয়ে পড়ল। চেষ্টা করতে লাগল ঘুমোবার। ঘুম কিন্তু এল না।

বার বার মনে হতে লাগল, সত্যিই কি অন্তরা উপলক্ষ্য মাত্র, দেশই আস লক্ষ্য···

দুইই এক।

অংশুমান চোখ খুলে দেখলে, আবার দুজন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছেন দেখেই চিনতে পারলে, দুজনেরই ছবি অনেকক্ষণ ধ'রে দেখেছিল সে আ সকালে। হেন্‌রি আর ফ্যারাডে।

ফ্যারাডে হেসে বললেন, আমরা দুজনেই প্রমাণ করেছি যে, দুইই এক ইলেক্‌ট্রিসিটি আর ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। বিদ্যুৎপ্রবা লোহার তারকে যেমন চুম্বকে পরিণত করে, চুম্বকও লোহার তারকে তেমন বিদ্যুতায়িত করতে পারে। শুধু তাই নয়, এখন আমরা বুঝেছি, একই শক্তি বহু রূপ। বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলো—একই শক্তির বিভিন্ন লীলা। ক্লোরিন গ্যা যখন লিকুইড হ'ল, তখনও তাই দেখলাম। তোমার প্রেমও তাই। অন্ত আর দেশ যাকেই ভালবাস, জিনিসটা এক। ওটাও এনার্জির আর একটা রূ বোধ হয়। হঠাৎ থেমে গেলেন ফ্যারাডে, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তারপর বললেন, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গতি। দ্রুতগতি, নিরবচ্ছি আবর্তন। চুম্বকের ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে আবর্তিত হ'লে সামান্য ধাতুখণ্ডেও বিদ্যুৎ তরঙ্গ বইবে। দ্রুতগামী বিদ্যুৎতরঙ্গের সমীপবর্তী হ'লে সামান্য লৌহখণ্ডও পরিণত হবে চুম্বকে। সামান্য কামারের ছেলে মাইকেল ফ্যারাডেও জীবনে ঘূর্ণাবর্তে দ্রুতবেগে আবর্তিত হতে হতে চুম্বক হয়ে উঠেছিল, তাই না তার টানে স্বয়ং সার্ হাম্‌ফ্রি ডেভি এসে হাজির হয়েছিলেন তার দ্বারে। হা-হা-হা-হা—

উচ্চকণ্ঠে হেসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ফ্যারাডে।

জোসেফ হেন্‌রি দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দ হয়ে। যেন অ্যাপোলো। ঋজু বলিষ্ঠ, সৌম্য শান্ত। চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে মনীষা ও মাধুর্যের মিলন-মহিমা। স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ অংশুমানের দিকে।

তারপর বললেন, ফ্যারাডে যা বললেন, তা ঠিক। গতিই আসল। চুম্বকের আবহাওয়ায় অবিরাম বিঘূর্ণিত না হ'লে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইত না, আর তা না বইলে গ'ড়ে উঠত না বর্তমান জগৎ। সবই ঠিক। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত, শুধু গতি নয়, গতি-পথেরও বিশেষ মূল্য আছে একটা। একই বৈদ্যুতিক শক্তি সোজা তারে যতটা স্পার্ক দেয়, তার চেয়ে ঢের বেশি দেয় তারটা কয়েল

ধরে নিলে। তোমাদের পরাধীনতার মোচড় তেমন জোরালো হয় নি বোধ হয়, ার জোরে স্পার্ক দিতে পারছ না···। তাঁর গম্ভীর মুখ হাস্যস্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

জোরালো হয় নি? এর চেয়ে আর কি হবে!—ব'লে উঠল অংশুমান। তা লে বোধ হয় লীক করছে কোনখান থেকে। লীক করলে জোর ক'মে যায়। র্জনের ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেট যে বেশি ভারী জিনিস তুলতে পারে নি, তার রণ তারগুলো ইন্‌স্যুলেটেড ছিল না। আমি পাড়ার মেয়েদের খোশামোদ ক'রে প্রত্যেক তারের গায়ে সিল্কের ওয়াড় পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার াগ্‌নেট তাই জোরালো হয়েছিল। তোমরা শক্তিকে সংহত করতে পারছ না াধ হয়। বাজে বক্তৃতার অকারণ লম্ফঝম্পে অনেক শক্তি নষ্ট হচ্ছে সম্ভবত···

কিসের শক্তি আপনি বলছেন?

ধর, প্রেমেরই। ও, কিন্তু আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

স্ক্রীনিং এফেক্‌ট্‌ হতে পারে। প্রাইমারি কয়েল আর সেকেণ্ডারি কয়েলের মাঝখানে যে কোন একটা ধাতুর চাদর রাখলে কারেন্টের জোর ক'মে যায়। অস্তরা আর তোমার মাঝখানে সমাজটা স্ক্রীনের কাজ করছে হয়তো, কিংবা হয়তো তোমার দ্বিধা। সিমিলারলি, দেশ আর তোমার মাঝখানে বিদেশী শাসন, কিংবা তোমাদের তামসিকতা কিংবা সামথিং, ঠিক জানি না··· এইগুলো অনুসন্ধান করা দরকার। আচ্ছা ধর, না থাক্‌, রাত হয়েছে, ঘুমোও তুমি।

আচ্ছা, অস্তরাকে ভালবেসেছি ব'লে দেশের প্রতি আমার একনিষ্ঠতা কি ক'মে যেতে পারে?—প্রশ্নটা না ক'রে পারলে না অংশুমান।

তা কখনও যায় নাকি? এই আমারই বেলা দেখ না, আমি তো জীবনে একনিষ্ঠ হতে পারি নি। ছেলেবেলায় একনিষ্ঠ কবি ছিলাম, কাব্য নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকতাম। সেকালের এমন কোন নভেল নাটক ছিল না, যা পড়ি নি। শুধু নিজে পড়তাম না, আর পাঁচজনকে ডেকে প'ড়ে শোনাতাম। থিয়েটার করা একটা বাতিক ছিল। যেখানেই সৃষ্টির মহিমা দেখেছি, মন মেতে উঠেছে। গ্রগারির বইখানাও যেই হাতে পড়ল, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মন। কল্পলোকের নূতন একটা দ্বার খুলে গেল যেন। কাব্য ভাল লাগত ব'লে বৈজ্ঞানিক হতে আমার আটকায় নি। বস্তুত বড় বৈজ্ঞানিক আর বড় কবিতে

কোন তফাতই দেখতে পাই না আমি। অস্তরার প্রতি তোমার প্রেম দেশ-প্রেমকে ম্লান করবে কেন? বিজ্ঞানের উপমা দিয়েই যদি বলি, বেশি তার জড়ালে ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটের শক্তি যদি বাড়ে—দেশের বেশি লোককে ভালবাসলে দেশ-প্রেমই বা বাড়বে না কেন? দেশ মানে—দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষ। দেশের মানুষকে ভালবাসি ব'লেই দেশের মাটি ফুল ফল কীট পতঙ্গ পর্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ তো ভালবাসা দিয়েই হয়। সেই যোগসূত্র দিয়েই তুমি তোমার আদর্শ তোমার আবেগ সুদূরপ্রসারিত করতে পার নিত্য নূতন লোককে ভালবেসে। যত বেশি লোককে ভালবাসবে, তত বেশি জোর পাবে। আর একটা বৈজ্ঞানিক উপমা মনে পড়ছে। অ্যাম্‌পিয়রই প্রথমে ভেবেছিল যে, বিদ্যুতের তরঙ্গযোগে দূরে খবর পাঠানো সম্ভব। চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু হ'ল না তার তরঙ্গের জোর ছিল না ব'লে। বার্লো দেখিয়ে দিলে যে, দুশো ফিটের বেশি যাবার শক্তি নেই তার। আমি কিন্তু আমার ইন্‌টেন্‌সিটি ব্যাটারি আর ইন্‌টেন্‌সিটি ম্যাগ্‌নেট দিয়ে এক মাইলের বেশি দূর পর্যন্ত কারেন্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। এক মাইল দূরে গিয়ে আমার কারেন্ট ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌লটিকে ঘুরিয়ে ঠিক ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল।

কৃতিত্বের আনন্দে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তা হ'লে প্রেমের একনিষ্ঠতা ব'লে আপনি কিছু মানেন না?

মানি বইকি। কাব্য পড়েছি, প্রেমের একনিষ্ঠতা মানি না? কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শক্তি শুধু প্রেম নয়। একটি খাবারের প্রতি তুমি যদি একনিষ্ঠ থাকতে পার, তার জন্যে বাহবা অবশ্যই তোমার প্রাপ্য। কিন্তু একাধিক খাবার খেয়ে হজম করতে পারলে একনিষ্ঠতা থাকবে না বটে, কিন্তু শক্তি বাড়বে। তা ছাড়া প্রথম জীবনে মানসিক একনিষ্ঠতার অর্থ আছে নাকি কোন? যতটা পার, যেখান থেকে পার আহরণ ক'রে যাও। সমস্ত পরিপাক ক'রে প্রাণবন্ত জীবনীশক্তির সংহত একনিষ্ঠতা পরে হবে। আমি প্রথম জীবনে কাব্য নিয়ে ছিলাম, তারপর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-জগতেও এক রাস্তায় চলি নি। ইলেক্‌ট্রিসিটি নিয়ে ছিলাম অনেকদিন। তারপর আবিষ্কার করলাম থার্মো-টেলিস্কোপ। সূর্যের গায়ে যে কালো কালো স্পট আছে, তাদের টেম্পারেচার কত তাই নিয়ে কাটল কিছুদিন। তারপর কোহিশন অব লিকুইড্‌স্‌, ফস্‌ফরেসেন্‌স্‌, শব্দ-বিজ্ঞান, কত কি করেছি, এখনও করছি, কিন্তু লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়েছে

ব'লে তো মনে হয় না। না না, ওসব ভুল ভাবছ, অন্তরা তোমার দেশ-প্রেমের ক্ষতি করতে পারবে না। ঘুমোও, অনেক রাত হয়েছে, চললাম···

মিলিয়ে গেলেন।

অংশুমানের মনের সমস্ত গ্লানি অপসারিত হয়ে গেল। অন্তরার ভালবাসাটা কাঁটার মত বিঁধে ছিল মনে। দেখতে দেখতে ফুল হয়ে ফুটে উঠল সেটা। চোখ বুজে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, অন্তরাই যেন দেশ-মাতৃকা।

"যাচ্ছি—যাচ্ছি—তোমারই কাছে···"

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল আবার।

৬

ছোট বড় স্তূপ স্তর নানাবিধ মেঘপুঞ্জ নিঃশব্দ মন্থর গতিতে একত্রিত হয়েছে পূর্বদিগন্তে। রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দিক স্তব্ধ। চক্রবালরেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী স্তম্ভিত হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, কাল-কালিন্দীর কৃষ্ণ-তরঙ্গমালা মূর্ত হয়ে স্থির হয়ে গেছে যেন সহসা অদ্ভুত কোন মন্ত্রবলে। বেতসবনে অস্ফুট মর্মরধ্বনি উঠছে একটা। অন্ধকার অন্তরের অব্যক্ত বেদনা মূর্ত হতে চাইছে যেন সে অস্পষ্টতায়। কিসের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করছে সব! সারি সারি বাদুড় উড়ে চলেছে। বর্ষা-স্নাত বনানীর বন্য-মদির গন্ধে অন্ধকার ভারাক্রান্ত। ঝিল্লী ডাকছে না। সমস্ত নিঃশব্দ। সেই নিঃশব্দতার পটভূমিকায় অস্ফুট মর্মর-ধ্বনির সূক্ষ্মজাল সূক্ষ্মতর হচ্ছে ক্রমশ অন্ধকারের নিবিড়তায়। কি যেন একটা আসন্ন! সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সবাই। সহসা মেঘের কোলে কোলে লাগল জরির পাড়, বৃক্ষশ্রেণীর শিখরে শিখরে জাগল জ্যোতির আভাস, ঝিল্লীর কণ্ঠে ফুটল ভাষা, আকুল হয়ে উঠল বনমর্মর।

চাঁদ উঠল। চিরকাল যেমন ওঠে।

ক্রমশ

"বনফুল"

আমরা ভুলিয়া যাব

আমরা ভুলিয়া যাব, আমাদের রবে না স্মরণে
এ মহামৃত্যুর কথা, এ বীভৎস ঘৃণ্য আত্মঘাত,
হীন স্বার্থলোভীদের এ চক্রান্ত মানুষ-হননে,
অরণ্যের কুটিলতা নগরীর পথে অকস্মাৎ
আমরা ভুলিয়া যাব—পৃথিবী ভুলেছে বার বার,
তোলে আর চলে তাই সুবিচিত্র বিপুল সংসার।

সংবাদ-সাহিত্য

বিভীষিকা-বিপর্যয়ের মধ্যে 'শনিবারের চিঠি' উনিশ বৎসরে পদার্পণ করিল। যাঁহারা লেখায় ও পড়ায়, বিজ্ঞাপনে ও বিতরণে, প্রশংসায় ও নিন্দায় আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

'শনিবারের চিঠি'র মাসিক প্রকাশের মামুলি অনিয়ম এই হাঙ্গামার দরুন চরমে উঠিয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ নাচার ও নিরুপায় হইলেও আমাদের পাঠকসমাজের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিতেছি না বলিয়া এমনিতেই আমাদের লজ্জার অবধি নাই। বেকার বসিয়া থাকিতে থাকিতে অলস মনে ছোরাছুরি বোমাবারুদ ও অ্যাসিড-আগুনের দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মেজাজেরও ঠিক নাই। ইহার উপর চিঠিপত্রে ও টেলিফোনে বহু অনুগ্রাহকের মুহুর্মুহু তাগাদা আমাদের গ্লানি ও সরকারী ডাকবিভাগের আয় বাড়াইয়া চলিয়াছে। বাংলা দেশের এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা শহরের শাসনতন্ত্র যে কদর্য অব্যবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে, তাহাতে কবে যে আবার এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য লেন-দেন পত্রিকা প্রকাশ ও বিতরণ সুনিয়ন্ত্রিত হইবে বলিতে পারি না। সকলকেই কষ্ট করিয়া ধৈর্য ধারণ করিতে বলা ছাড়া আমাদের কিছুই করিবার নাই।

গত সংখ্যায় আমরা লিখিয়াছিলাম, "পূজার পর পর্যন্ত যদি টিকিয়া থাকি, তাহা হইলে আশা করিতেছি, কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই কার্তিকের পত্রিকা বাহির করিতে পারিব।" দুর্ভাগ্যক্রমে টিকিয়া আছি বটে, কিন্তু কার্তিক শেষ হইতে চলিল, তবু পত্রিকা বাহির করিতে পারিলাম না। কলিকাতার "ল অ্যাণ্ড অর্ডারে"র মাহাত্ম্যে গত ২৫ অক্টোবর হইতে ১০ নবেম্বর পর্যন্ত হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আমাদের কোনও দায়িত্ব নাই।

• • •

প্রবন্ধ ও রচনাদি প্রকাশ সম্বন্ধেও বিবিধ বিপর্যয় ঘটিয়াছে। বাংলা দেশের বুকের উপর যখন অবাধ হত্যা লুণ্ঠন নারী-হরণ ধর্ষণ ও তথাকথিত ধর্মান্তরিতকরণের তাণ্ডব চলিয়াছে, তখন স্বভাবতই কবিতায় মানসবিলাস অথবা প্রবন্ধে ভরতের নাট্যশাস্ত্র অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকাচরিত্র লইয়া সূক্ষ্ম-গবেষণামূলক আলোচনা করিতে মন সরে না। নোয়াখালির শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের মত মন এমন শক্ত করিতে পারি নাই যে, মুসলিম কালচার ও সংস্কৃতি লইয়া পাঁচ ঘাটে পাঁচটি প্রবন্ধের তরণী ভাসাইব। আমাদের সমস্যা বর্তমানে অত্যন্ত স্থূল, নিতান্তই বাঁচিয়া থাকার সমস্যা। তাহার সমাধানেই নিজেরা দিশাহারা হইয়া আছি। সাময়িক উত্তেজনায় মনে যাহা জাগিতেছে অসম্বদ্ধভাবে তাহাই বলিয়া বা লিখিয়া কোনও প্রকারে কর্তব্য সম্পাদন করিতেছি। নিজেই বুঝিতেছি এই সকল প্রবন্ধ বা রচনার কোনও শাশ্বত মূল্য নাই, হয়তো ভবিষ্যতে বর্তমানের সাময়িক

উত্তেজনাপ্রসূত মন্তব্যের জন্য নিজেরাই লজ্জা অনুভব করিব। তথাপি স্থান ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া শিল্পীর শাশ্বতলোকে বিচরণ করা সম্ভব হইতেছে না। ক্ষণিকের মধ্যেই চিরন্তনের সন্ধান দিতেছেন কথা-শিল্পীরা; সুতরাং প্রধানত তাঁহাদের সাহায্যই গ্রহণ করিতেছি।

• • •

জানি, একদিন এই আপাতসর্বনাশা কঠিন কুয়াশাজাল ছিন্ন হইবে, চিরদিনের প্রসন্ন সূর্যালোকে আমাদের দিগন্ত আবার উদ্ভাসিত হইবে। তখন স্থায়ী এবং শাশ্বতকে, সত্যশিবসুন্দরকে আমরা ফিরিয়া পাইব। ইহা আমাদের অন্ধ-বিশ্বাসের কথা, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী এবং দ্রষ্টা বাংলা দেশের বর্তমান ঘনঘটাময় দুর্যোগ সম্বন্ধে তাঁহারাও আশার বাণী শুনাইতেছেন। শ্রীঅরবিন্দ (পণ্ডিচারী ১৯ অক্টোবর ১৯৪৩) বলিয়াছেন—

"I have not been discouraged by what is happening, because I know I have experienced hundreds of times that beyond the blackest darkness there lies, for one who is a divine instrument the light of God's victory. I have never had strong and persistent will for anything to happen in the world—I am not speaking of personal things—which did not eventually happen even after delay, defeat or even disaster. There was a time when Hitler was victorious everywhere and it seemed certain that a black yoke of the *Asura* would be imposed on the whole world; but where is Hitler now and where is his rule? Berlin and Nuremburg have marked the end of that dreadful chapter in human history. Other blacknesses threaten to overshadow or even engulf mankind but that too will end as that nightmare has ended."

• • •

মহাত্মা গান্ধীও অনুরূপ বিশ্বাস লইয়া কুমিল্লা-নোয়াখালির দুর্গতদের সেবায় এবং নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত পল্লীবাসীদের স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় সেখানে গিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের বাণী ও রামনাম আজ আমাদের ভাল লাগিতেছে না, কিন্তু বিপুল ব্যাকুলতা লইয়া সহস্র পথের চিন্তা করিয়াও তো অন্য কোনও পথ দেখিতে পাইতেছি না! আজ মনে হইতেছে, হত্যা ও প্রতিশোধের এই পাপচক্র হইতে কোনও দিনই আমাদের মুক্তি নাই, অকারণ-প্রবাহিত রক্তধারায় আমাদের দৃষ্টি আবিল হইয়া গিয়াছে। মহতেরা বলিতেছেন, এই শোণিততপ্ত উত্তেজনা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বার বার এইরূপ ঘটিয়াছে এবং অবতার-কল্প মানুষের নেতৃত্বে দুর্গত ও মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগকে অতিক্রম করিয়াও গিয়াছে। আমরাও যাইব, এইটুকু মাত্র ভরসা।

• • •

বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের তরফ হইতে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণতম সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে হতাশার মধ্যেই আশার কথা শুনাইয়াছেন। তিনি (পূর্ণিয়া, ৩০. ১০. ৪৬) লিখিয়াছেন—

"এবার বাঁচবার আশা ছিল না, কেন যে বাঁচলুম জানি না। যে সময় পড়েছে, গেলেই ভাল ছিল। শুনেছি এইরূপ অবস্থার পর দেশের সাহিত্য বাড়বার পথ পায়। তা হ'লেও বুঝব, কিছু লাভ হ'ল। তোমরা ভাল থাকো এইটাই এখন প্রার্থনা করি। ওসব আসে যায়—কিছুদিনে ঠিক হয়ে যাবে। নিজের কাজ করে যাও, আমাদের যা আছেন।

সকলেই নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবে, কেউ ছোট হতে চায় না। আমি বুদ্ধিমানদের বড় ভয় করি। অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন তাঁরা এখন ইতিহাসের কলঙ্ক, পরিহাসের বস্তু। যেন ছোট হয়ে থাকতে পারি। বুদ্ধিমানেরা অসত্যকে ধ'রেই বড়। সে বুদ্ধি যেন ভগবান না দেন। এই আমার শেষ প্রার্থনা।"

এই বুদ্ধিমানদের কবল হইতে ভারতের দেবতা নিশ্চয়ই ভারতের সাধারণ মানুষদের রক্ষা করিবেন।

—

ভারতের প্রবীণতম নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মৃত্যুতে ভারতীয় সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার সমর্থনে ও আশীর্বাদে দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন যে সফলতার পথে চলিতেছিল, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাহাতে ছেদ পড়িতে দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, বঙ্গদেশ ও বিহারের শোচনীয় ঘটনা তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলিকে ক্লেশকর করিয়াছিল। সেই চরম দুঃখময় মুহূর্তে বিচলিত হইলেও তিনি তাঁহার শেষ কর্তব্য সম্পাদনে বিরত থাকেন নাই, আমাদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিবার নির্দেশ তিনি দিয়া গিয়াছেন। হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীকস্বরূপ তিনি সমগ্র জগতের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা, তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধন এবং তেজোজ্জ্বল মহনীয়তা এই নিরঙ্কুশ সর্ববিধসংস্কারমুক্তির যুগেও সকলের সশ্রদ্ধবিস্ময়ের উদ্রেক করিত। তিনি স্বভাবত পুরাতনপন্থী হইলেও শুভ ও কল্যাণকর নূতনকে সাদরে বরণ করিবার ঔদার্য বার বার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার রাজনৈতিক জীবন পূর্বাপর অগ্রগতিরই ইতিহাস।

কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। এখানকার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মধ্যে, শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে এবং বৎসরে বৎসরে দেশ ও সমাজসেবার উপযোগী কর্মী ও সেবক গঠনের কাজের মধ্যে তিনি চিরদিন জীবিত ও জাগ্রত থাকিবেন। আমাদের এই একান্ত দুঃসময়ে তাঁহার তিরোভাবে আমাদের দুর্ভাগ্যই সূচিত হইতেছে। তাঁহার অন্তিম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া আমরা যেন তাঁহার স্বর্গত আত্মার তৃপ্তিসাধন করিতে পারি।

—

নোয়াখালি ও কুমিল্লার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত আক্রমণে সংখ্যালঘিষ্ঠদের যে ব্যাপক ও স্থায়ী ক্ষতি হইয়াছে তাহার প্রতিশোধকল্পে বিহারের সংখ্যা-গরিষ্ঠদের সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত আক্রমণ ও তজ্জনিত জীবন ও সম্পত্তি হানি কম ঘৃণ্য

ও নিন্দনীয় নয়। মানবীয়তার সকল সংস্কার বর্জন করিয়া এই পাশবিক হত্যা ও লুণ্ঠন সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলকেই বেদনা ও লজ্জা দিতে বাধ্য। বিহারের উত্তেজনা সাময়িক ও একান্ত প্রতিশোধমূলক বলিয়া তাহা অচিরাৎ শান্ত হইয়াছে এবং সেখানকার দুষ্কৃতিকারী দুর্বৃত্তেরা ইতিমধ্যেই নিজেদের অপকীর্তির বহর দেখিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবার অবকাশ পাইতেছে। যে জওহরলাল জয়প্রকাশনারায়ণের কঠোর শাসন ও মহাত্মা গান্ধীর শাসানি-মূলক আবেদনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশে এখনও ঝড় বহিতেছে, নিজ বিহারে বিগারীরা তাহার প্রয়োজন ছিল বলিয়া এখন অনুভব করিতেছে। তাহাদের হাতে যাহা ধ্বংস হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ অসম্ভব হইলেও অনুসন্ধানে দেখা যাইতেছে তাহা ব্যক্তিগত ও পরিবারগত ক্ষতি। এই ক্ষতির দাগ মানুষের মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসিলে কালধর্মে মুছিবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু কুমিল্লা-নোয়াখালির যে ক্ষতি তাহার বেদনা সমগ্র সমাজদেহকে জর্জরিত করিয়াছে, এই জাতীয় অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া সুদূর ও দীর্ঘ প্রসারী হওয়া স্বাভাবিক। অনিচ্ছুক লোককে প্রাণের ভয় দেখাইয়া এবং সংখ্যাবাহুল্যের সুযোগে জোর করিয়া গোমাংস খাওয়াইয়া স্বধর্মে আনয়ন করিবার নির্দেশ কোন ধর্মপ্রবর্তকই দিতে পারেন না, বিরোধীমনোভাবাপন্ন মানুষ কোনও ধর্মেরই শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে না। ছুরির মুখে ভিন্নধর্মের নারীকে ধর্ষণ বা অঙ্কশায়িনী করার নীতি কখনও পবিত্র ইসলামের অনুমোদিত হইতে পারে না। যাহারা ইহা করিয়াছে তাহারা পশুমাত্র, কোনও ধর্মেরই আশ্রয় তাহারা লাভ করিতে পারে না। বাংলা দেশের অধুনা আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজ যদি এই সকল নরদেহধারী পশুকে শাসন না করিয়া, ভয়ে ভীত জনকে ও অপহৃতা নারীকে স্ব-স্ব সমাজে ও গৃহে ফিরাইয়া না দেন, অধিকন্তু দুষ্কৃতিকারীদের মামলাকে মুসলমান-ধর্মের মামলা করিয়া তুলেন, তাহা হইলে ইহার প্রতিফল একদিন তাঁহাদের পাইতেই হইবে। অনিচ্ছুক ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে ভুলক্রমে ধর্মে ও সমাজে স্থান দিয়া মুসলমান সমাজ ইতিমধ্যেই বহুভাবে কলঙ্কিত হইয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। লাঞ্ছিত ও নিগৃহীতদের সসম্মানে সমাজে ফিরিয়া লওয়ার দায়িত্ব হিন্দুদের; ইহাদিগকে অবাধে মুক্তি দিয়া এবং স্বস্থানে নিরুদ্বেগে ও নির্ভয়ে বসবাসের অধিকার দিয়া বাংলা দেশের ধার্মিক মুসলমানেরা এখনও ইসলামের গৌরব রক্ষা করুন। এই বিষয়ে "প্রসঙ্গ কথা"য় আমরা আরও কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নূতন বই! নূতন বই!

প্রবোধকুমার সান্যালের
যতদূর যাই ৩ নদ ও নদী ৪॥০
সুমথনাথ ঘোষের নূতন উপন্যাস
অহল্যার স্বর্গ ২।০ জটিলতা ২॥০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
দুর্ঘটনা (১৪খানি কার্টুন সহ নূতন সংস্করণ) ২॥০ প্রভাতসূর্য্য ২৸০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
জন্মান্তর ২॥০ উল্‌টো রথ ২॥০
সজনীকান্ত দাসের
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) ৫৲
অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের বাৎস্যায়নের
সাহিত্য পরিক্রমা ২॥০ কামবিজ্ঞান ২৲
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবযান (নূতন সংস্করণ) ৫৲ উপলখণ্ড ২।০ অসাধারণ ৩৲ নবাগত ২॥০ ক্ষণভঙ্গুর ২।০
নরেশচন্দ্র পাল অনূদিত
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প (পঞ্চম খণ্ড) ২॥০
প্রথম খণ্ড (রাশিয়া) ৩।০ দ্বিতীয় খণ্ড (রাশিয়া) ৩।০ তৃতীয় খণ্ড (ফ্রান্স—যন্ত্রস্থ)
মিত্র ও ঘোষ: ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা